দেওবন্দিয়াত ও আমরা

(আত্মসমালোচনা)

ইফাদাত

হজরতে আকদাস মাওলানা মুফতি সাইদ আহমাদ পালনপুরি

(জন্ম: ১৯৪০, মৃত্যু: ১৯মে ২০২০)

কুদ্দিসা সিররুহু

সাবেক শাইখুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক, দারুল উলুম দেওবন্দ।

সঙ্কলন

উবায়দুল্লাহ আসআদ কাসেমি

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ ঢাকা

দেওবন্দিয়াতে ও আমরা

সূচীপত্র

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা.. ৪৮

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা.. ৫০

সূচনাঃ ৫৯

দেওবন্দিয়াত তিন বস্তুর নাম................................ ৫৯

প্রথম অধ্যায়ঃ ৬০

إِحْيَاءُ السُّنَّةِ: সুন্নাহকে প্রাণবন্ত করা ৬০

কুরআন-হাদিসের নাম-ই হচ্ছে দেওবন্দিয়াত ৬০

দারুল উলুম দেওবন্দ কী? ৬১

কাসেমি-রশিদি চেতনা... ৬২

উলামায়ে দেওবন্দের চিন্তাগত মধ্যপন্থা ৬৪

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ৬৬

(প্রথম পরিচ্ছেদ) ৬৬

إِمْحَاءُ الْبِدْعَةِ: বিদআতের নিশ্চিহ্নকরণ ৬৬

সুন্নাতের আড়ালে বিদআত!.................................. ৬৬

বেরলভিদের সাথে আমাদের পার্থক্য........................ ৬৭

আমরা কোথায়? ৬৯

মূলনীতি থেকে সরে দাঁড়ানো ৬৯

কবরে নেইমপ্লেট ব্যবহার করা ৬৯

উলামা-তলাবাদের সমীপে একটি আর্জি.................... ৭৩

মাজারঃ উলামায়ে দেওবন্দ এবং বেরলভিদের অবস্থান.. ৭৬

কবরে নেইমপ্লেট লাগানোর হুকুম ৭৬

বুজুর্গদের কবর উচুঁ করা বিদআত.......................... ৭৭

কবর চতুর্ভুজ বা পাকা করা ৭৮

মিনার বা খিলানযুক্ত ছাদ নির্মাণ............................ ৮০

এ যুগে মুশরিকদের নমুনা...................................... ৮১

বর্তমান যুগে ইহুদিদের নমুনা ৮২

ভয়ঙ্কর ফিতনা! ৮৩

ফিকহঃ কুরআন-হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক হলে করণীয় কী?
.... ৮৬

একটি দৃষ্টান্ত.. ৮৭

মাজারের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা ৮৮

কোন ব্যক্তির কথা দলিল নয় ৮৮

আকাবিরের অনুসরণ বনাম আকাবির পূজা ৯০

দীন বিকৃতির একটি আকৃতি ৯০

মাদরাসায় বা মসজিদের পাশে দাফন করা.................৯১

প্রথমদিকে জিয়ারত নিষিদ্ধতার কারণ ৯৩
যাদের কবর জিয়ারত করা যাবে ৯৩
অনুমতি কাদের ব্যাপারে? ৯৪
একটি ঘটনা ৯৫
জিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি ৯৫
ইবরাহিম বিলয়াবির আমল ৯৬
কবরের প্রতি সীমাহীন সম্মান-প্রদর্শন করা যাবে না ৯৭
মাসে একবার হলেও কবরস্থানে যাওয়া উচিত............ ৯৮
নবিদের কবর প্রসঙ্গ ১০০
পানজাবে নবিদের মাজার রয়েছে? ১০২
(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)... ১০৮
পির-মুরিদি ১০৮
আত্মশুদ্ধির বাইআত কেন? ১০৮
বাইআতের উপকারিতা ১০৯
পির-মুরিদি: বাড়াবাড়ি এবং শিথিলতা.....................১০৯
আমাদের তাসাউফের উৎস? ১১০
বাইআতের উদ্দেশ্য...১১০
শরিয়ত এবং তরিকত অভিন্ন বস্তু ১১১

জুহদ ও ইহসানের প্রামাণিকতা..............................১১২
ইসলামি পরিভাষার সংরক্ষণ করা জরুরি ১১৪
বেরলভিদের সাথে আমাদের পার্থক্য কোথায়? ১১৫
ফ্রি খাওয়ানো!..১১৫
খেলাফত নিয়ে চলছে ব্যবসা! ১১৫
নানুতাভি ও গাঙ্গুহির খুলাফা ১১৬
বাড়াবাড়ির কবলে পির-মুরিদি..............................১১৭
ছাত্রদেরকে বাইআত করা প্রসঙ্গ...........................১২০
পির-মুরিদদের সম্মিলিত জিকিরের হুকুম..................১২২
(তৃতীয় পরিচ্ছেদ)..১২৪
তাসাউফ: সালাফি মতাদর্শ...................................১২৪
তাসাউফ: ইবনে তাইমিয়ার অবস্থান.......................১২৫
ইমাম জাহাবি ও তাসাউফ...................................১২৫
(চতুর্থ পরিচ্ছেদ) ১২৮
শোকসভার হুকুম ১২৮
অস্বীকৃত কাজের বারণ জরুরি............................ ১৩০
কথিত পাঁচ রুপির ঘটনা! ১৩০
হাকিমুল ইসলামের বিচক্ষণতা.............................১৩১

সালিম কাসেমির ওপর অনুষ্ঠিত শোকসভা...............১৩২
মাতম নিষিদ্ধের কারণ?..১৩২
কুসংস্কারের সংশোধন কীভাবে করব?.................... ১৩৪
তৃতীয় অধ্যায়: ১৩৫
আত-তালাক্কি আনিস সালাফ ১৩৫
সালাফের অনুসরণ: দারুল উলুম দেওবন্দের............ ১৩৫
উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে.................................. ১৩৫
ঘটনাবলীর হুকুম...১৩৬
ঘটনাবলী দ্বারা আকিদা বিনষ্ট হয় ১৩৬
পরিশিষ্ট-১ .... ১৩৮
আকাবিরদের তাফাররুদাত: আমাদের করণীয়.......... ১৩৮
আমাদের করণীয় ১৩৮
তাফাররুদাতের মর্ম...১৪০
একটি দৃষ্টান্ত..১৪১
তিনি কি দীন বুঝেননি?......................................১৪২
দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া......................... ১৪৩
তাহাজ্জুদের জামাআত: তাকি উসমানির দৃষ্টিতে.........১৪৪
শাইখের ভুল হলে করণীয় কী ১৪৭

বুজুর্গদের আমল কখন দলিল?............................ ১৪৭

পরিশিষ্ট-২... ১৫০

প্রচলিত খতমে বুখারি: কিছু কথা.......................... ১৫০

দেওবন্দে নীরব এক খতমে বুখারি!...................... ১৫০

খতমে বুখারি: দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া.........১৫১

খতমে বুখারি: আধুনিক মূর্খতা! ১৫১

খতমে বুখারি: বাড়াবাড়ির লাগাম টেনে ধরুন............১৫৪

খতমে বুখারি: দেওবন্দিয়াতের খেলাপ.................. ১৫৫

পরিশিষ্ট-৩... ১৫৭

তওহিদ ও উলামায়ে দেওবন্দ............................. ১৫৭

বিদআতের মোকাবেলায় উলামায়ে দেওবন্দ............ ১৫৮

তওহিদ: নজদি চেতনা! ১৫৯

চেতানায়ে নজদি: আমাদের মিল-অমিল..................১৬০

একটি ভ্রান্তির নিরসন!..১৬০

উলামায়ে দেওবন্দের বুজু.....................................১৬১

শিরিক এবং বিদআত নির্মূলে আমরা অভিন্ন ১৬৪

ভূতের মুখে রাম নাম! ১৬৫

পরিশিষ্ট-৪ ....১৬৯

ওয়াহদাতুল উজুদ: আমাদের আকিদা নয়................১৬৯
হুসাইন বিন মনসুরের হিন্দুস্তানে আগমন................ ১৭০
পরিশিষ্ট-৫..১৭১
জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ: অপব্যাখ্যা বর্জনীয়...............১৭১
নফসের জিহাদ বড় জিহাদ!................................ ১৭৫
পাঠদান কি জিহাদ?... ১৭৭
জিহাদ: দরসে বুখারি থেকে................................ ১৭৭
জিহাদ ইসলামি শিক্ষার কোন অংশ নয়?................ ১৭৮
জিহাদ একটি মজলুম ফরজ! ১৭৯
পরিশিষ্ট-৬.. ১৮০
সিফাতে বারি তাআলা: আমাদের অবস্থান ১৮০
আহলে হকের দৃষ্টিভঙ্গি ১৮১
পরিশিষ্ট-৭.. ১৮৪
নামে যত্রতত্র উপাধি: আমাদের আদর্শ নয়.............. ১৮৪
পরিশিষ্ট-৮.. ১৮৬
শরয়ি লিবাস: আমরা বাড়াবাড়িতে লিপ্ত!................ ১৮৬
টুপি: কত কলির হওয়া সুন্নাত!............................ ১৮৬
সুন্নতি লিবাস: পানজাবি না জুব্বা?........................ ১৮৮

সব ধরনের পোশাক বৈধ: কিছু শর্তের সাথে ১৮৮

নোট:...১৯০

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا

আর আমি তোমাদেরকে এমন একটি দল বানিয়েছি, যারা নেহায়েত মধ্যপন্থী।

“নিভু নিভু চেতনা ফের জ্বলে উঠুক।”

“আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বা কুরআন-হাদিসের অপর নাম হচ্ছে, দেওবন্দিয়াত। উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিত পরিমাণও পার্থক্য নেই।”

“ দারুল উলুম দেওবন্দের মতাদর্শ হচ্ছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত, হানাফি মাজহাব এবং দারুল উলুমের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতাদ্বয় হজরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতাভি এবং হজরত মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহির মতাদর্শ। ”

“যদি বলা হয় যে, দারুল উলুম দেওবন্দের মতাদর্শ হচ্ছে, হাদিসে জিবরিলের বাস্তব রূপ, তাহলে তা বেমানান হবে না।”

“আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বা কুরআন-হাদিসের অপর নাম হচ্ছে, দেওবন্দিয়াত। উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিত পরিমাণও পার্থক্য নেই।”

“তাদের দলীয় চিন্তাধারায় না আছে বাড়াবাড়ি এবং না আছে কঠোরতা। এই উন্মোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এতে না আছে তাকফিরবাজি, না আছে কুৎসা রটানো এবং না আছে কারো ব্যাপারে গালি-গালাজ বা কাউকে মন্দ বলা।”

“ কিছু লোক মনে করে যে, দেওবন্দিরা নব-সৃষ্ট কোন ফিরকা! তাদের মূলনীতি এবং আকিদা সম্পূর্ণ ভিন্ন! আল্লাহর কাছে পানাহ চাই, এমন কথার কোন সত্যতা নেই।”

“ *আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদার ভিত্তি হচ্ছে, কুরআন, হাদিস এবং তিন স্বর্ণযুগের আমলের ওপর। অতএব, যেসব কথা কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত এবং তিন স্বর্ণযুগের পরে উদ্ভাবিত হবে, তা কুসংস্কার এবং দীনের মধ্যে নব-সৃষ্ট গণ্য হবে।* ”

“দেওবন্দিয়াত কী? অন্যরা দূরের কথা, স্বয়ং দারুল উলুম দেওবন্দের পড়ুয়ারাও এ বিষয়ে অনবগত! তারা জানেন না যে, আসলে দেওবন্দিয়াত কী?”

“যেসব কথা এবং আমল কুরআন-সুন্নাহর মোতাবিক হবে, তা-ই দেওবন্দিয়াত। এই মতাদর্শে কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী কিছু নেই এবং এর কোন সুযোগও নেই।”

“দারুল উলুম দেওবন্দ কেবল একটি বিদ্যানিকেতন নয়, বরং দারুল উলুম দেওবন্দ হচ্ছে, বিদআতের মূলোচ্ছেদ এবং সুন্নাহর জীবিতকরণের একটি পরিকল্পিত মিশনের নাম।”

“ইলমে শরিয়ত, ইত্তিবায়ে তরিকত, সুন্নতের অনুসরণ, হানাফি ফিকহ, মাতুরিদি বিশ্বাস, দিফায়ে জালালত এবং কাসেমি-রশিদি রুচি-ই হচ্ছে এই মধ্যপন্থী মতাদর্শের সামষ্টিক উপাদান।”

“ *তারা দীন বুঝা এবং বুঝানোর ক্ষেত্রে শিথিলতার প্রবক্তা নন, যা অতীত থেকে একপ্রান্ত বিচ্ছিন্ন। কেননা তা যুগ যুগ ধরে চলে আসা ধারাবাহিক কোন পথ নয়, বরং এক নতুন পথ।* ”

“তারা এমন বাড়াবাড়ির প্রবক্তা নয়, যা রসম-রেওয়াজ এবং বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে সব বিদআতকে ইসলামে ঢুকিয়ে দেয়।”

“যারা ইসলাম এবং হেদায়েতের আলো দ্বারা উদ্দীপ্ত ছিলেন, তাদের অনুসরণ শুধু এমন না যে, নিন্দনীয় নয়, বরং এটা-ই অভীষ্ট।”

“উলামায়ে দেওবন্দ হচ্ছেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত নামক মতাদর্শের দলপতি ও পতাকাবাহী।”

“আমাদের দেওবন্দি মতাদর্শে কোন ধরনের বিদআত, কুসংস্কার এবং কু-প্রথার অবকাশ নেই।”

“দেওবন্দি মতাদর্শ অন্যান মতাদর্শ থেকে স্বতন্ত্র একটি মতাদর্শ।”

“ কিন্তু হিন্দুস্তানের মুসলমানরা বুঝে-ই না, তারা সব কিছু করতে রাজি। কিন্তু কবরস্থান দ্বিতীয়বার ব্যবহার করতে রাজি নয়।”

“দেওবন্দিরা এখন বেরলভিদের কোলে উঠে বসেছেন!”

“কবর এক হাত থেকে উঁচু করা মুসতাহাব এবং এরচে বেশি করা মাকরুহ। কেউ করে থাকলে তা ভেঙ্গে ফেলা মুসতাহাব।”

“ তারা কবরকে-ই নিজেদের চাওয়া-পাওয়ার স্থান বানিয়ে নিয়েছে!”

“আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্যের এবাদত থেকে বিপজ্জনক কী আছে?”

"*দুঃখজনক সত্য যে, বর্তমানে আমরা দেওবন্দিরা মূল দেওবন্দিয়াতে নই! আমরা দূরে ছিটকে যাচ্ছি! বেরলভিয়াতের স্রোতে ভাসছি, তাদের দিকে ধাবিত হচ্ছি!*"

“যারা দারুল উলুম দেওবন্দকে উম্মুল মাদারেস মানেন, তারা যেন খতমে বুখারির অনুষ্ঠান পরিহার করেন।”

“ *কিন্তু বাংলাদেশে খতমে বুখারি নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যে কৈফিয়তে হচ্ছে, তা বিদআত পর্যায়ে চলে যাচ্ছে! অতএব, আপনারা সম্মিলিতভাবে এর লাগাম টেনে ধরুন এবং আস্তে আস্তে একে বন্ধ করে দিন।* ”

"আপনারা উম্মতের অনুসরণীয়। অতএব, আপনাদের প্রতিটি কদম হতে হবে খুবই সতর্কতার সাথে। আপনাদের পদস্খলন মানে জাতির পদস্খলন।"

“ কিন্তু রসম বানিয়ে আড়ম্বনার সাথে খতমে বুখারির অনুষ্ঠান করা অগ্রহণীয়। কারণ মানুষ একে ধীরে ধীরে আলাদা এবাদত মনে করতে লাগবে। এজন্য অবশ্য-ই এগুলো পরিহারযোগ্য। ”

“ তাজ্জবের বিষয় হচ্ছে যে, যেই শাইখ সারা বছর পুরা বুখারির দরস দিতে পারেন, তিনি শেষ হাদিসটি পড়াতে পারেন না? শেষ হাদিস পড়ানোর জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করা লাগে? এটা কোন তামাশা! ”

“আর এই নিকটতম জাহিলিয়াতের কিছু বস্তু এখনো অবশিষ্ট আছে। এর বাস্তব একটি উদাহরণ হচ্ছে, বর্তমান যুগের জাঁকজমকপূর্ণ খতমে বুখারির অনুষ্ঠানের প্রথা।”

“লকব বৃদ্ধিকরণে ব্যাপকতা এবং এতে বর্ধন করা: সালাফের জীবনচরিতে নেই।”

“ জিহাদ গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ এবাদত অথচ আমাদের ওয়াজ মাহফিলগুলোতে জিহাদ বিষয়ে আলোচনা হয় না। আমাদের সভা-সমাবেশগুলোকে এর আলোচনা থেকে অনেক দূরে রাখা হয়।”

“আশ্চর্যের বিষয় হল যে, যখন থেকে মিশরসহ অন্যান্য মুসলিম দেশের উপর ইউরোপীয় শক্তির প্রভাব বিস্তার হল, তখন এই ধরনের নতুন কথা উদ্ভব হতে লাগল যে, ইসলামে কোন যুদ্ধ নেই, কোন কিতাল নেই! আর জিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, লেখালিখি করা, বক্তৃতা দেয়া এবং দাওয়াত ও তাবলিগের মেহনত করা! এ ছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য নয়।”

“বর্তমানে যে যত বড় আলেম,

তার কবরে তত বড় নেইমপ্লেট! ”

“আজ আমরা দেওবন্দি হওয়া সত্ত্বেও বুজুর্গদের কবর পাকা করছি না!? কবরে টাইল লাগাচ্ছি না!?”

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

أحمد الله الذي أكمل لنا ديننا، وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، وأرشدنا لهذا الإسلام فلا نرضى به بدلا، وأخرجنا من ظلمات الجهل والبدع إلى نور الفقه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا نبغي عن ذلك حولا. والصلاة والسلام على محمد الذي فتح به أعينا عميا، وبعد:

মানুষ দুর্বল, কখনো ভুলের উর্ধ্বে নয়– এ হিসেবে বইয়ের প্রথম সংস্করণে আমাদের থেকে যতেষ্ট গাফিলতি হয়েছে। এজন্য আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

এর সবচে বড় কারণ হল যে, সমুদয় বই মোবাইলের নোটবুকে লিখে মুহতারাম প্রকাশক বরাবর পাঠানো হয়। তিনি একে বিজয় ফ্রন্টে কণভার্ট করেন এবং এর সংশোধনে যতেষ্ট শ্রম দিয়েছেন। তারপরও অনেক ভুল রয়ে গেছে। আমার দ্বিতীয়বার দেখার সুযোগ হয়নি। প্রথম সংস্করণে বইটি বিন্যস্তও ছিল না। আলহামদুলিল্লাহ, এবারের মুদ্রণে সাধ্যনুযায়ী সংশোধন করা হয়েছে এবং বইয়ের বিন্যাসেও আমূল পবির্তন আনা হয়েছে। তারপরও ভুল থাকা স্বাভাবিক। পাঠকমহলে কোন ভুল দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে বাতলে দিয়ে নসিহতের হক আদায় করতে বিনীত অনুরোধ রইল।

এবারের মুদ্ররণে বইকে মোট তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে এবং আরো কিছু বিষয় পরিশিষ্টে রাখা হয়েছে। বইয়ে কিছু সংযোজন করা হলেও কিছু বিষয় বাদও পড়েছে। বিশেষ করে *হজরতুল উসতাজের জীবনী* এবং *জামাতে ইসলামি এবং গায়রে মুকাল্লিদদের শরয়ি হুকুম* নামক দুটি নিবন্ধ। এগুলোকে স্বতন্ত্র পুস্তিকা করার ইচ্ছা রয়েছে। বইয়ের সামনের কোন সংস্করণে আরো সংযোজনের চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আমি শোকরিয়া আদায় করছি খুসুসি জামাআতের ছাত্র প্রিয় ইমদাদুল্লাহর। সে বইটি কয়েকবার আদ্যপ্রান্ত পাঠ করে ভুলগুলো চিহ্নিত করে দিয়েছে। দুআ করি, আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে যেন দীনের জন্য কবুল করে নেন এবং তার পছন্দমতো চলার তওফিক দান করেন। আমিন॥

উবায়দুল্লাহ আসআদ কাসেমি

উসতাজে হাদিস,

জামেআ কাসিমিয়া দারুল উলুম নারায়ণগঞ্জ।

১৯/৩/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

তোমরা দারুল উলুম দেওবন্দে লেখা-পড়া করে থাক। কিন্তু দেওবন্দিয়াত নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন কর না এবং এর প্রচার-প্রসারও কর না। ফলে তোমাদের দেশ অতি শীঘ্র বিদআতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে!– উসতাজে মুহতারাম, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হজরত মাওলানা মুফতি সাইদ আহমাদ পালনপুরি কুদ্দিসা সিররুহু আমাদেরকে সম্বোধন করে প্রায়শ এই কথা বলতেন। কথাটি আমার জন্য ভীষণ পীড়াদায়ক মনে হল! পাক্কা ইরাদা করলাম যে, যতদিন বেঁচে থাকব, দেওবন্দিয়াতের চেতনা বুকে লালন করে থাকব। তিক্ত হলেও সত্য কথা বলব, বিশুদ্ধ কথা লিখব, ইনশাআল্লাহ।

দারুল উলুম দেওবন্দে থাকাকালীন হজরতুল উসতাজ হাফিজাহুল্লাহুর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম এবং আমলে আনার চেষ্টা করতাম, এখনো চেষ্টা করি। অতি গুরুত্বের সাথে তার দরসে বসতাম, যেন মাথায় পাখি বসে আছে। তিনি দরসে যেসব কিতাব মুতালাআ বা মুরাজাআ করতে বলতেন, আল্লাহর রহমতে মাদরাসার কুতুবখানা বা অন্য কোথাও থেকে তা মুতালাআ করার চেষ্টা করতাম। তার প্রতিটি কথাকে তার লিখনীর সাথে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করতাম। আসরের পর তার মজলিসে হাজির হওয়ার চেষ্টা করতাম। আমি তার প্রতিটি কথায় প্রেরণা ও জীবনপথের পাথেয় খুঁজে পাই।

আবার এমন নই যে, তার সব কথা অন্ধভাবে গ্রহণ করে নিই, বরং নিরীক্ষণ করে তার অধিকাংশ চিন্তা-চেতনা বাস্তবতার মুওয়াফিক হওয়ায় বিশ্বাস করি। আর একজন তালেবে ইলম উসতাজের কথা শুধু উসতাজ হিসেবে অন্ধভাবে মানতে বাধ্য নয়, বরং সে অন্যান্য তালেবে ইলমের মতো বাছবিচার করে যেটি বিশুদ্ধ, গ্রহণীয় এবং উপযুক্ত মনে করবে, তা-ই গ্রহণ করবে। এমনটা করলে তার থেকে অন্ধপনা, গোঁড়ামি এবং সীমাবদ্ধতা দূর হবে এবং বিস্তর মুতালাআর মাধ্যমে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারবে।

শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ হালবি (মৃত্যু: ১৪১৭ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আমার একশোর কাছাকাছি হাদিসের শাইখ রয়েছেন, যাদের থেকে আমি ইলম অর্জন করেছি ও উপকৃত হয়েছি। তাদের প্রত্যেকের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস ও চিন্তাধারা।(১) আমি তাদের কারো কথা উসতাজ এবং শাইখ হিসেবে মানা জরুরি মনে করিনি, বরং তাদের থেকে তা-ই গ্রহণ করেছি, যা আমি সঠিক, বিশুদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্য বিবেচিত করেছি। এ ক্ষেত্রে কখনো ভুল করেছি, আবার কখনো বিশুদ্ধতায় পৌঁছেছি, অন্যান্য তালেবে ইলমের ন্যায়।(২)

দেওবন্দি মতাদর্শ কী? আমরা কে? আমাদের দায়িত্ব কী? প্রশ্নটি সাদামাটা মনে হলেও জবাব অত্যন্ত কঠিন অথবা বিলকুল সহজ! আমরা সোজাসুজি জবাব দিতে না পারায় তা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে! ফলে বিভিন্ন ফিরকার তরফে আমাদের বিরুদ্ধে হাজারো অভিযোগ উত্তাপন হচ্ছে। আমরা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে না পারায় বিপাকে পড়তে হয়। আমাদের কেউ কেউ তো তাদের সমস্ত অভিযোগকে আমাদের মূল মতাদর্শ মনে করে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেন। তালগোল করে জবাব দেয়ার চেষ্টা করেন! কিন্তু কাজের কাজ কিছু-ই হয় না। উল্টো আমাদের-ই দুর্বলতা প্রকাশ পায়।

তাদের অধিকাংশ অভিযোগ-ই অসত্য, আসলে তা দেওবন্দিয়াতে নেই। কিন্তু আমরা একে দেওবন্দিয়াত মনে করে খামোখা জবাব দিয়ে নিজেদের-ই ক্ষতিসাধন করছি!

ধরুন হুসাইন বিন মনসুর হাল্লাজ বা ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদার কথা! আমরা তাকে আল্লাহর ওয়ালি সাব্যস্ত করলাম এবং ওয়াহদাতুল উজুদের ব্যাখ্যা করে একে ওয়াহদাতুশ শুহুদ প্রমাণ

---

(১) যেমন: শাইখ জাহেদ কাওসারি, আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের এবং আবদুল্লাহ বিন সিদ্দিক গুমারি রাহিমাহুমুল্লাহ। তিনজন-ই ছিলেন ভিন্ন চিন্তাধারার।

(২) কালিমাতুন ফি কাশফি আবাতিলা ওয়া ইফতিরাআত, পৃ. ৩৭।

করলাম! তো এতে দীনের কোন ফায়দা হল? না অভিযোগের ফিরিস্তি আরো দীর্ঘ হল? হাশরের ময়দানে আমরা কি তার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হব? এই ভ্রান্ত আকিদা না রাখলে আমাদের ইমান অসম্পূর্ণ থাকে নাকি? তাহলে কেন এত তাকাল্লুফ! অথচ এমন অভিযোগের উত্তর নেহায়েত সহজ ও বিলকুল সংক্ষিপ্ত! আমরা এভাবেও তো জবাব দিতে পারি যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অপর নাম হল দেওবন্দিয়াত। উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিত পরিমাণও ফরক নেই। পৃথিবীর যে সমস্ত মুসলমান সুন্নাত জামাআতের আকিদাভুক্ত এবং প্রত্যেক ধরনের বিদআত, কুসংস্কার এবং কু-প্রথা থেকে মুক্ত হবেন, তারাও দেওবন্দি। যদিও তারা কখনো দারুল উলুম দেওবন্দের নাম পর্যন্তও শোনেনি। আর যে তাদের পথ ও মত থেকে বিচ্যুত হবে, তাকে দেওবন্দি বলা মুশকিল ব্যাপার! যদিও সে দারুল উলুম দেওবন্দে অবস্থান করে, দারুল উলুমের সমীপে থাকে।

কিছু লোক মনে করে যে, দেওবন্দিরা নব-সৃষ্ট কোন ফিরকা! তাদের মূলনীতি এবং আকিদা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন! আল্লাহর কাছে পানাহ চাই, এমন কথার কোন সত্যতা নেই।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদার ভিত্তি হচ্ছে, কুরআন-হাদিস এবং তিন স্বর্ণযুগের আমলের ওপর। অতএব, যেসব কথা কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত এবং তিন স্বর্ণযুগের পরে উদ্ভাবিত হবে, তা কুসংস্কার এবং দীনের মধ্যে নব-সৃষ্ট (বিদআতের) আওতাভুক্ত করা হবে। (১)

উসতাজে মুহতারাম কুদ্দিসা সিররুহু প্রায়শ দেওবন্দি মতাদর্শ বিষয়ে আমাদেরকে সচেতন করতেন। গত বছর ষান্মাসিক পরীক্ষার পর পবিত্র উমরার সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে লাগাতার তিন দিন দরস বন্ধ রেখে শুধু এ বিষয়ে নিজের মনের ব্যথা আমাদের সামনে প্রকাশ করেছেন। সেই বয়ানে তিনি বলেছিলেন: দারুল উলুম

(১) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে।

দেওবন্দের মজলিসে শুরার মিটিংয়ে দুই দুইবার আলোচনা হয় যে, দেওবন্দিয়াত কী? বর্তমানে অন্যরা দূরের কথা, স্বয়ং দারুল উলুম দেওবন্দের পড়ুয়ারাও এ বিষয়ে অনবহিত! তারা জানে না যে, দেওবন্দিয়াত কী? তারা কারা? তাদের দায়িত্বভার কী? তারা করবে কী? অতএব, এ বিষয়ে সবিস্তারে কোন কিতাব লেখার প্রয়োজন আছে। আর এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করতে মিটিংয়ে অধমের নাম প্রস্তাব করা হয় এবং তা সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর তারা আমার কাছে লিখিত আবেদনপত্র পাঠালে আমি এই মর্মে অপারগতা প্রকাশ করি যে, আমি বর্তমানে *তাফসিরে হেদায়েতুল কুরআন* লেখায় ব্যস্ত, তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য বিষয়ে কলম ধরা আমার পক্ষে সম্ভব নয়!

এ তো হল লোক দেখানো জবাব! মূল কারণ হল, যেভাবে হাতির লৌকিকতার জন্য দৃশ্যমান কিছু দাঁত থাকে, তেমনিভাবে চিবানোর জন্যও ভিতরে কিছু দাঁত থাকে। আমি যদি এ বিষয়ে বই লিখি, তাহলে সবাই আমার শত্রু হয়ে যাবেন। এমনিতেই আমার শত্রু অনেক! তবে তোমাদেরকে বলে রাখি যে, আমি এই বিষয়ে বই লিখব। তবে তা মৃত্যুর আগে পাবলিশ হবে না! যেমনিভাবে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ রাহিমাহুল্লাহ *পাক-ভারত পৃথকতার নৈপত্যে কারা* বিষয়ে একটি বই লিখে লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করেছিলেন এবং মৃত্যুর পঁচিশ বছর পর তা পাবলিশ করতে ওসিয়ত করেছিলেন, যাতে করে সমসাময়িক সকলের মৃত্যুর পর তাদের মুখোশউন্মোচন হয়। অন্যথায় পরিস্থিতি নেহায়েত ঘোলাটে হয়ে যাবে। আমিও লিখব। তবে সন্তানদেরকে ওসিয়ত করেছি। আবারো করব, যেন আমার মৃত্যুর পরে তা ছাপানো হয়!

সেদিন আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সেই বইয়ের অনুবাদ করার স্বপ্ন দেখছিলাম! অপেক্ষার প্রহর গুণছিলাম, কবে আসবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ! আলহামদুলিল্লাহ, অবশেষে কিছুটা হলেও অপেক্ষার তিক্ততা হ্রাস পেয়েছে! গত ১০আগস্ট ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে হজরতুল

উজতাজ দামাত বারাকাতুহুম সদ্য প্রায়ত মাওলানা সালিম কাসেমি রাহিমাহুল্লাহুর ওপর কৃত শোকসভা উপলক্ষে "দেওবন্দিয়াত কিয়া হে" শিরোনামে কলম ধরেছেন এবং পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। মুহূর্তে-ই তা পিডিএফ আকারে ছড়িয়ে পড়ে, হোয়াটসঅ্যাপের বিভিন্ন গ্রুপে। তা আমার নজরে আসলে "আদদীনু আননাসিহা" হিসেবে অনেককে শেয়ার করি। কারো তো উপকার হতে পারে! জীবন তো পাল্টে যেতে পারে– এই প্রত্যয়ে।

প্রথম দিন থেকে ইচ্ছা ছিল যে, এই পাঁচ পৃষ্ঠা অনুবাদ করে বাংলা ভাষীদেরকে অবগত করা। কিন্তু প্রত্যুষে স্বপ্নময়ী, বিকেলে ভেঙ্গে পড়ি– এই ছিল অবস্থা! অবশেষে মাদরাসার প্রথম সাময়িক পরীক্ষার খেয়ারের সময় তওফিকে এলাহি প্রাপ্ত হলাম। অনুবাদের সাথে কিছু টীকা-টিপ্পনী সংযোজনের প্রয়োজনবোধ করলাম। ভাবছিলাম সবমিলিয়ে অনূর্ধ্ব ৩২ পৃষ্ঠা হবে। কিন্তু পরে পৃষ্ঠাসংখ্যা বিদ্যুৎতরঙ্গে এ পর্যন্ত এসে দাঁড়ায়! ফালিল্লাহিল হামদ। নিজের মুতালাআর সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও প্রাসঙ্গিক কিছু থাকলে তাও সংযোজনের চেষ্টা করেছি। বিশেষত হজরতুল উসতাজের রচনা থেকে। ফলে তা স্রেফ অনুবাদ থাকেনি, স্বতন্ত্র সঙ্কলনের রূপ ধারণ করে।

বইয়ে কোন অংশের সাথে কারো দ্বিমত থাকতে পারে, থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার। আদাবুল ইখতিলাফ এবং ভাষাশৈলী অক্ষুণ্ন রেখে সমালোচনা করলে অগ্রিম স্বাগত জানাই।

শাইখুল ইসলাম মাওলানা তাকি উসমানি জিদা মাজদুহু লিখেন: উলামায়ে দেওবন্দের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের বুজুর্গদের শিক্ষাদীক্ষা আমাদেরকে এমন সঠিক পথ দেখিয়েছে যে, শরিয়তের মাসআলার ব্যাপারে স্বাধীন মত-প্রকাশ করা শিষ্টাচার বহির্ভূত নয়, বরং ছাত্রদের মত-প্রকাশ আসাতিজাদের বাস্তবিক সাহচর্য।(১)

(১) ফিকহি মাকালাত।

ইমাম হাফিজ আবু মুসা ইউনুস বিন আবদুল আলা সাদাফি মিশরি রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন ইমাম শাফেয়ির বিশিষ্ট ছাত্র। তিনি বলেন: আমি ইমাম শাফেয়ি থেকে অধিক বুদ্ধিমান কাউকে দেখিনি। একদিন আমি তার সাথে কোন মাসআলায় মুনাজারা করে পৃথক হয়ে যাই। ফের তার সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি আমার হাতে ধরে বললেন, আবু মুসা! এটা কি হতে পারে না যে, আমরা ভাই ভাই হয়ে চলব। যদিও কোন মাসআলায় সহমত নাও হতে পারি।(১)

আমি তো বলি, উসতাজে মুহতারাম তাদের একজন, যারা কখনো পরোয়া করেন না যে, তাদের ব্যাপারে কী বলা হচ্ছে। তবে সর্বদা তা-ই বলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন, যা বলা তাদের ওপর অপরিহার্য। কে সম্মান দিল এবং কে সমালোচনা করল? তা কখনো ভ্রুক্ষেপ করেন না। আমি তো উসতাজে মুহতারামের ইলমি অবস্থানের ব্যাপারে অকপটে তা-ই বলতে পারি, যা ইমাম জাহেদ হাসান কাওসারির ব্যাপারে কেউ বলেছিল যে, যেমন তার হাতে রয়েছে প্রদীপ্ত আলোকদানি। তিনি এর আলোকরশ্মি বই-পুস্তকের দিকে তাক করে আলোকিত করে গবেষকবৃন্দ এবং অনুসন্ধানকারীদের জন্য মূল্যবান এবং বিস্ময়কর উদ্ধৃতি বের করে নিয়ে আসেন।(২)

আলইনসানু বাইনাল ইখতায়ি ওয়াল ইসাবাহ এবং *মান সান্নাফা ফাকাদিসতুহদিফা* হিসেবে বইয়ে যে কোন ধরনের ভুল থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার। সঠিক কোন কথা লিখলে আল্লাহর পক্ষ থেকে, অন্যথায় আমার এবং শয়তানের পক্ষ থেকে।

পবিত্র কুরআনুল কারিম ব্যতীত কোন কিতাব নির্ভুলের চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। আমবিয়া আলাইহিমুস সালামের পরে কেউ-ই নিষ্পাপ নন। এজন্য কিতাবের কোথাও কোন ধরনের গোঁজামিল দেখা দিলে

---

(১) সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১১/৩৭০, জাহাবি, রিসালাতুল উলফাতি বাইনাল মুসলিমিন, পৃ. ১৭, ইবনে তাইমিয়া, তাহকিক: আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ।
(২) কাওয়ায়িদ ফি উলুমিল হাদিস, পৃ. ২, ইলাউস সুনান, ১৪তম খণ্ড।

আদ্দিনুন নাসিহা (১) হিসেবে বাতলে দেয়ার বিনীত অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব, ইনশাআল্লাহ।

ইমাম আবু সুলাইমান হামদ বিন মুহাম্মাদ খাত্তাবি (২) রাহিমাহুল্লাহ কতইনা সুন্দর বলেছেন যে, যে কেউ এতে এমন কোন হরফ বা অর্থ সম্পর্কে অবগত হবে, যা পরিবর্তনযোগ্য। আমরা তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে তা সংশোধন করে নসিহতের হক আদায় করতে মিনতি করব। কেননা মানুষ দুর্বল, ভুল থেকে নিরাপদ নয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যদি স্বীয় অনুগ্রহে তাকে রক্ষা করেন।(৩)

প্রসিদ্ধ সুফি হারেস মুহাসিবি রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ জেনে রেখো, যে ব্যক্তি তোমাকে নসিহত করল, নিশ্চয় সে তোমাকে ভালোবাসল। আর যে তোমাকে অসৎ কাজ করতে দেখেও সন্তুষ্টি প্রকাশ করল, প্রকৃতপক্ষে সে তোমার সাথে প্রতারণা করল। যে ব্যক্তি তোমার উপদেশ গ্রহণ করল না, সে তোমার প্রকৃত ভাই নয়।

উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেনঃ ঐ জাতির মাঝে কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, যারা নসিহতকারী নয়। আর ঐ জাতির মাঝে কোন কল্যাণ নেই, যারা উপদেশদাতাদেরকে ভালোবাসে না।(৪) তিনি আরো বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে উমরকে তার দোষ-ত্রুটির দিকে রাহনুমায়ী করে।(৫) হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আরো বলেনঃ যদি তোমরা আমার ভুল শোধরে না দাও,

---

(১) সহিহ মুসলিমঃ ৯৫।

(১) মৃত্যুঃ ৩৮৮ হিজরি।

(৩) মা ইয়ামবাগি বিহিল ইনায়া লিমান ইউতালিউল হিদায়া, (ভূমিকা) পৃ. ১১, হিফজুর রহমান কুমিল্লায়ি, মাকতাবায়ে শাইখুল ইসলাম ঢাকা।

(৪) রিসালাতুল মুসতারশিদিন, পৃ. ৭১, হারিস মুহাসিবি।

(৫) হিলয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া, ২/১৫০, আবু নুআইম আসবাহানি, রিসালাতুল মুসতারশিদিন, পৃ. ৭১ এর সূত্রে।

(৫) কাওয়ায়িদ ফি উলুমিল হাদিস, পৃ. ২১।

তাহলে তোমাদের মাঝে কোন কল্যাণ নেই। আমার মধ্যেও কোন উৎকৃষ্টতা নেই, যদি তোমাদের অভিযোগ না শুনি।(১)

শাইখ আবদুল ফাত্তাহ হালবি রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তি-ই প্রত্যাখ্যাত এবং তার কথা খণ্ডনকৃত।(২)

বইটি কারো বিরুদ্ধে লেখা হয়নি। কে কার বিরুদ্ধে লিখবে? এটি নিছক আত্মসমালোচনামূলক একটি বই, যাতে করে আমাদের মাঝে দেওবন্দিয়াতের নামে ঘাপটি মেরে থাকা অদেওবন্দিয়াতের বিলুপ্তি ঘটে। শ্রেষ্ঠ তো ঐ ব্যক্তি যে, নিজের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে দৃষ্টিসম্পন্ন এবং অন্যের ত্রুটি সম্পর্কে অন্ধ।

হিন্দুস্তানের অনুসন্ধানকারী আলেম, বহু গ্রন্থপ্রণেতা মাওলানা মুফতি শুআইবুল্লাহ খান সাহেব মিফতাহি জিদা মাজদুহুকৃত *গুলু ফিদ্দিন* বইয়ে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে উসতাজে মুহতারাম মুফতি সাইদ আহমাদ পালনপুরি কুদ্দিসা সিররুহু লিখেনঃ অন্যদের সমালোচনার শিকার হওয়া থেকে নিজেদের দোষ-ত্রুটি নিজেরা-ই বলা উত্তম।(৩)

ডক্টর তহা জাবির ফাইয়াজ আলওয়ানিকৃত *আদাবুল ইখতিলাফ ফিল ইসলাম* বইয়ের ভূমিকায় উমর উবাইদ হাসানা লিখেছেনঃ আমরা কমই আমাদের ভিতরগত বিষয়ে লক্ষ্য করি। কেননা অন্যদের দোষ-ত্রুটি নিয়ে নিয়োজিত থাকা, এর প্রচার করা এবং এর পিছনে লেগে থাকা নিজেদের আভ্যন্তরীন কাঠামোতে চিন্তার সুযোগ দিচ্ছে না। অথচ

---

(১) নুরুল আনওয়ার বিশারহি মানারিল আনওয়ার, পৃ. ২১৫, মুল্লা জিওয়ান, আলমাকতাবাতুল ইসলামিয়া ঢাকা।

(৩) গুলু ফিদ্দিন, পৃ. ২০

হাদিস বলছে, শুভ সংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য, যাকে নিজের দোষ-ত্রুটি অন্যের খুঁত অন্বেষণ করা থেকে নির্লিপ্ত রাখে।(১)

পরিশেষ বইটি লেখার ক্ষেত্রে যে বা যারা কোন ধরনের সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তাআলা সকলকে ইহকাল-পরকালে উত্তম বিনিময় দান করুন। আর রাব্বে কারিম যেন চেষ্টাটুকু কবুল করে নেন এবং আমাদের সবাইকে তার দীনের জন্য কবুল করে নেন এই দুআ কামনা করি। আমিন॥

উবায়দুল্লাহ আসআদ কাসেমি
২৩/১১/২০১৮খ্রিষ্টাব্দ।

(১) আদাবুল ইখতিলাফ ফিল ইসলামের ভূমিকা।

সূচনাঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله إمام المتقين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، وبعد:

দেওবন্দিয়াত কী এবং কেন? এই প্রশ্নের জবাব বর্তমানে সাধারণ মানুষ দূরের কথা জাতির রাহবর সম্মানিত আলেমরাও জানেন না! এমনকি দারুল উলূম দেওবন্দের পড়ুয়ারাও জানেন না! আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, দেওবন্দ তো একটি টাউনের নাম। এ কথা অবশ্যই আমরা জানি। কিন্তু দেওবন্দিয়াত কী? তা আমাদের জানা নাই। সুতরাং আমাদেরকে তা জানতে হবে, মানতে হবে।

দেওবন্দিয়াত তিন বস্তুর নাম

দেওবন্দিয়াতের মূলনীতি হচ্ছে তিনটি:

১- ইহয়াউস সুন্নাহঃ সুন্নাহকে প্রাণবন্ত করা।

২- ইমহাউল বিদআহ: বিদআতের মূলোচ্ছেদ করা।

৩- আত-তালাক্কি আনিস সালাফঃ সালাফে সালেহিন থেকে দীনের বিষয়বস্তু গ্রহণ করা।

প্রথম অধ্যায়ঃ

إِحْيَاءُ السُّنَّةِ: সুন্নাহকে প্রাণবন্ত করা

শিরিক-বিদআতে উর্বর ভূমি উপমহাদেশে তওহিদ এবং সুন্নাহকে প্রাণবন্ত করার লক্ষ্যে আমাদের আসলাফ-আকাবিররা প্রতিষ্ঠা করেন আজহারে হিন্দ দারুল উলুম দেওবন্দ তথা দেওবন্দি মিশনকে। যে মিশনে কোনরকম উগ্রতা-শিথিলতা নেই, নেই এতে অতিমাত্রার কঠোরতা নেই অতিশয় উপেক্ষা করা। যেসব কথা এবং আমল কুরআন-সুন্নাহর মোতাবিক হবে, তা-ই হচ্ছে দেওবন্দিয়াত। এই মতাদর্শে কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী কিছু নেই এবং এর কোন সুযোগও নেই।(১)

কুরআন-হাদিসের নাম-ই হচ্ছে দেওবন্দিয়াত

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু লিখেনঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বা কুরআন-হাদিসের অপর নাম হচ্ছে দেওবন্দিয়াত। উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিত পরিমাণও পার্থক্য নেই। পৃথিবীর যেসব মুসলমান সুন্নাত জামাআতের আকিদাভুক্ত হবেন এবং প্রত্যেক ধরনের বিদআত, কুসংস্কার ও কু-প্রথা মুক্ত হবেন, তারা-ই দেওবন্দি। যদিও তারা কখনো দেওবন্দের নামও পর্যন্ত শুনেননি। আর যে তাদের পথ ও মত থেকে বিচ্যুত হবে, তাকে দেওবন্দি বলা মুশকিল ব্যাপার। যদিও সে দেওবন্দে থাকে, দারুল উলুমের অধীনে থাকে!

কিছু মানুষ মনে করে যে, দেওবন্দিরা নব-সৃষ্ট কোন ফিরকা! তাদের মূলনীতি এবং আকিদা সম্পূর্ণ ভিন্ন! আল্লাহর কাছে পানাহ চাই! এমন কথার কোন সত্যতা নেই। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদার ভিত্তি হল, কুরআন-হাদিস এবং তিন স্বর্ণযুগের আমলের ওপর। অতএব, যেসব কথা কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত এবং তিন

---

(১) দেওবন্দিয়াত কিয়া হেঃ বয়ান থেকে।

স্বর্ণযুগের পরে উদ্ভাবিত হবে, তা কুসংস্কার এবং দীনের মধ্যে বিদআতের আওতাভুক্ত গণ্য করা হবে।(১)

হজরত মাওলানা কারি মুহাম্মাদ তায়্যিব রাহিমাহুল্লাহ বলেন: উলামায়ে দেওবন্দ নিজেদের দীনি রুখ এবং মতাদর্শগত মেজাজ হিসেবে সম্পূর্ণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত। তারা নব উদ্ভাবিত কোন ফিরকা নয়, নতুন আকিদার কোন দল নয়, যা সময় এবং পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এজন্য দেশে এবং বহির্বিশ্বে এই একটি-ই দল আছে, যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদাসমূহ এবং মূল স্তম্ভ ও নীতিমালার যথাযথ সংরক্ষণ করেছে এবং এর শিক্ষা দিয়েছে। ফলে আজ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অস্তিত্ব বিদ্যমান। যে মতাদর্শ দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতাগণ নিজেদের মূল এবং পুরাতন রঙে আপন ছাত্র এবং মাধ্যম/মাধ্যমহীন ট্রেনিং প্রাপ্তদের মাধ্যমে ছড়িয়ে একে বিশ্বজনীন করেছেন।(২)

দারুল উলুম দেওবন্দ কী?

দারুল উলুম দেওবন্দ কেবল একটি বিদ্যানিকেতন নয়, বরং দারুল উলুম দেওবন্দ হচ্ছে, বিদআতের নির্মূলকরণ এবং সুন্নাহর জীবিতকরণের পরিকল্পিত একটি মিশনের নাম। এজন্য আমাদের ফুজালাগণ আগে দৃঢ়তার সাথে সুন্নাহর শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর বিদআতকে মূলোচ্ছেদ করতে আপ্রাণ চেষ্টা-সাধনা করেন।(৩)

---

(১) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে, পৃ. ১-২।

(২) উলামায়ে দেওবন্দ কা দীনি রুখ ওয়া মাসলাকি মিজাজ, পৃ. ২৩, কারি মুহাম্মাদ তায়্যিব, এদারায়ে ইসলামিয়াত লাহোর, পাকিস্তান।

(৩) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে, পৃ. ২।

কাসেমি-রশিদি চেতনা

হজরত হাকিমুল ইসলাম কারি তায়্যিব রাহিমাহুল্লাহু দারুল উলুম দেওবন্দ এবং দারুল উলুম দেওবন্দের মতাদর্শ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেন: অতঃপর যখন এই স্বয়ংসম্পূর্ণ দেওবন্দি মতাদর্শ নিজের সামগ্রীক গুণাবলীসহ দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম মুরব্বি ও বুজুর্গদ্বয় হজরত নানুতাভি রাহিমাহুল্লাহ এবং হজরত গাঙ্গুহি রাহিমাহুল্লাহুর অন্তর দিয়ে অতিক্রম করে প্রকাশিত হল, তখন তা যুগের চাহিদা পূরণে এক নির্দিষ্ট আকৃতি ধারণ করল। যাকে *মতাদর্শ* শব্দে ব্যাখ্যা করা হয়। সুতরাং দারুল উলুম দেওবন্দের মূলনীতিতে– শাবান ১৩৬৮হিজরির সংশোধিত– এই বাস্তবতাকে নিম্নবর্ণিত শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

> দারুল উলুম দেওবন্দের মতাদর্শ হচ্ছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত, মাজহাবে হানাফি এবং দারুল উলুমের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতাদ্বয় হজরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতাভি এবং হজরত মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহির মতাদর্শ।(১)

এজন্য দারুল উলুম দেওবন্দের মতাদর্শের অবিচ্ছেদ্য অংশে এ কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার ওপর দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষা-দীক্ষার মূল ভিত্তি, যা তাসাউফের অধীনে এসে থাকে। আর এর সম্পর্ক আধ্যাত্মিক দীক্ষার সাথে। অতএব, ইলমে শরিয়ত, ইত্তিবায়ে তরিকত, সুন্নতের অনুসরণ, হানাফি ফিকহ, মাতুরিদি বিশ্বাস, দিফায়ে জালালত এবং কাসেমি-রশিদি রুচি-ই হচ্ছে, এই মধ্যপন্থী মতাদর্শের সামষ্টিক উপাদান, যা (سَبْعَ سَنَابِلَ فِیْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ) এর বাস্তব রূপ। যদি এই (سَبْعَ سَنَابِلَ)কে শরিয়তের ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে ইমান, ইসলাম, ইহসান এবং ইজহারে দীন দ্বারা করা যেতে পারে। আর যদি বলা হয় যে, দারুল উলুম দেওবন্দের মতাদর্শ হল, হাদিসে জিবরিলের বাস্তব রূপ, তাহলে তা বেমানান হবে না।

---

(১) দুস্তুরে আসাসি, পৃ. ৬।

তিনি আরো বলেন: অতঃপর এই সমস্ত মূল উপাদানের ভিত্তি হল: আল্লাহর কিতাব, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত, উম্মাহর ঐক্যমত এবং গবেষকদের গবেষণা। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত দলিল দুই তাশরিয়ি: যদ্দারা শরিয়ত তৈরি হয় এবং দ্বিতীয় দুই দলিল তাফরিয়ি: যদ্দারা শরিয়ত প্রকাশিত হয়।(১)

(১) দারুল উলুম দেওবন্দ কি জামে ও মুখতাসার তারিখ, পৃ. ১৪৪, মুহাম্মাদুল্লাহ কাসেমি, শাইখুল হিন্দ একাডেমি দারুল উলুম দেওবন্দ।

উলামায়ে দেওবন্দের চিন্তাগত মধ্যপন্থা

মনে রাখতে হবে যে, উলামায়ে দেওবন্দ দীন বুঝার ক্ষেত্রে কোন ধরনের বাড়াবাড়ি বা শিথিলতার শিকার হননি। হাকিমুল ইসলাম সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর ভাষায়ঃ উলামায়ে দেওবন্দ দীন বুঝা এবং বুঝানোর ক্ষেত্রে শিথিলতার প্রবক্তা নন, যা অতীত থেকে একপ্রান্ত বিচ্ছিন্ন। কেননা তা যুগ যুগ ধরে চলে আসা ধারাবাহিক কোন পথ নয়, বরং এক নতুন পথ। আর তারা এমন বাড়াবাড়ির প্রবক্তা নয়, যা রসম-রেওয়াজ এবং বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে প্রত্যেক বিদআতকে ইসলামে ঢুকিয়ে দেয়। যে আমলে খাইরুল কুরুন থেকে অদ্যাবধি অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতা থাকবে না, সে আমল ইসলাম হতে পারে না।

তারা এই বক্তব্যের পূর্ণ প্রবক্তা, যা কুরআন-হাদিসের ঝরনা থেকে ইসলামের নামে চলে আসছে। বস্তুতঃ কুরআনে কারিম বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণের শুধু এই কারণে নিন্দা করেছে যে, তাদের ঐ সমস্ত বাপ-দাদারা বুদ্ধি এবং হেদায়েতের আলো থেকে ছিল বঞ্চিত। যারা ইসলাম এবং হেদায়েতের আলোয়ে উদ্দীপ্ত ছিলেন, তাদের অনুসরণ শুধু এমন নয় যে, নিন্দনীয় নয়, বরং এটা-ই অভীষ্ট। আমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, শুধু আমবিয়া আলাইহিমুস সালামের নয়, বরং সিদ্দিকিন এবং সালেহিনের পথে চলা এবং অন্যকে চালানোর জন্য প্রত্যেক নামাজের পর আল্লাহ তাআলার কাছে আবেদন করা। কেননা এটা-ই হচ্ছে সঠিক পথ।(১)

হাকিমুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ আরো লিখেছেনঃ উলামায়ে দেওবন্দ হলেন এই (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত নামক) মতাদর্শের দলপতি ও পতাকাবাহী। এজন্য-ই তারা এই সমন্বয়কারী

---

(১) দারুল উলুম দেওবন্দ কি জামে ওয়া মুখতাসার তারিখ, পৃ. ১৫১, আরো দেখুনঃ কারি তায়্যিব রাহিমাহুল্লাহকৃত উলামায়ে দেওবন্দ কা দীনি রুখ আওর উনকা মাসলাকি মিজাজ, দারুল উলুম দেওবন্দঃ বুনয়াদি উসুল ও মাসলাক।

মতাদর্শ এবং এ সব দীনি জ্ঞানের মিলনে একই সময় ছিলেন মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুতাকাল্লিম, সুফি, মুজাহিদ এবং মুফাককির।

অতঃপর এ সব জ্ঞানের সংমিশ্রণে তাদের মেজাজ ছিল মধ্যপন্থী। আর এ কারণে-ই তাদের দলীয় চিন্তাধারায় না আছে বাড়াবাড়ি এবং না আছে কঠোরতা। এই উন্মোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এতে না আছে তাকফিরবাজি, না আছে কুৎসা রটানো এবং না আছে কারো ব্যাপারে গালি-গালাজ বা মন্দ বলা। না আছে হিংসা-বিদ্বেষ ও ইন্দ্রিয়াবেগ, না আছে পদ-সম্পদের বড়ত্ব এবং না আছে সীমাহীন বিলাসিতা, বরং তাদের কাজ হচ্ছে, শুধু মাসআলা বয়ান করা অথবা উম্মতের সংশোধন করা এবং বাতিলকে বাতিল সাব্যস্ত করা। তাদের মধ্যে না আছে ব্যক্তিত্বের অবজ্ঞাকরণ, না আছে গালি-গালাজের প্রবেশাধিকার, না আছে দাম্ভিকতার দোষারোপ বা হাসিঠাট্টা করা।– এ সব গুণাবলী এবং অবস্থার সমষ্টির নাম হচ্ছে, দারুল উলুম দেওবন্দ। ইলমি-আমলি এই পরিপূর্ণতার কারণে তার প্রভাব পৃথিবীময় বিস্তৃত।(১)

---

(১) দারুল উলুম দেওবন্দ কি জামে ও মুখতাসার তারিখ, পৃ. ১৪২।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

(প্রথম পরিচ্ছেদ)

إِمْحَاءُ الْبِدْعَةِ: বিদআতের নিশ্চিহ্নকরণ

আমাদের দেওবন্দি মতাদর্শে কোন ধরনের বিদআত, কুসংস্কার এবং কু-প্রথার অবকাশ নেই। ফলে মধ্যেপন্থার অধিকারী উলামায়ে দেওবন্দ বিদআতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ভারত উপহাদেশ থেকে বিদআতের আস্ফালন বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, আজ পুনরায় দুই তৃতীয়াংশ দেশ বিদআতের কালো অধ্যায়ে আচ্ছাদিত হতে চলছে! অতএব, আমাদেরকে এ সবের বিরুদ্ধে ফের রুখে দাঁড়াতে হবে, অন্যথায় ভবিষ্যৎ হবে অন্ধকার! ।(১)

সুন্নাতের আড়ালে বিদআত!

পূর্বে বলা হয়েছে যে, আমাদের মানহাজে কোন ধরনের বিদআতের অবকাশ নেই। কিন্তু কিছু কথা আছে, যা মনুষ্য রচিত, যা কখনো কখনো সুন্নাতের সদৃশপূর্ণ হয়ে থাকে। মানুষ একে সুন্নাত মনে করতে শুরু করে। কিন্তু কিছু দিন যাওয়ার পর এর মূলতত্ত্বের পর্দা ফাঁস হয়ে মুখোশউন্মোচন হয়ে যায়। যখন দেওবন্দ আন্দোলন শুরু হয়, তখন বাদায়ুনি এবং বেরলভি আলেমরা আমাদের সাথে অনেক বিষয়ে মতানৈক্যের সূচনা করেছিলেন। তারা এগুলোকে বৈধ, বরং সুন্নাত হিসেবে সাব্যস্ত করত। আকাবিরে দেওবন্দ কঠিন পরিশ্রম করে তাদেরকে এ কথা বুঝানোর চেষ্টা করেন যে, এ সব কথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের গণ্ডিবহির্ভূত। কিন্তু মনস্তাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, অদ্যাবধি এই মতভেদ বিদ্যমান!(২)

---

(১) দেওবন্দিয়াত কিয়া হেঃ বয়ান থেকে।

(২) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে, পৃ. ২।

বেরলভিদের সাথে আমাদের পার্থক্য

বেরলভিদের সাথে আমাদের চিন্তাগত অনৈক্যের একটি দৃষ্টান্ত হল, প্রচলিত মিলাদ জায়েজ বা বিদআত হওয়া নিয়ে। হজরত হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রাহিমাহুল্লাহুর কাছে প্রথমদিকে এই মাসআলা স্পষ্ট হয়নি বিদায় তিনি এর প্রবক্তা ছিলেন, বরং এর ওপর আমলকারীও ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি তার পিরভাই, দেওবন্দি মতাদর্শের রূপকার মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রাহিমাহুল্লাহুর সাথে দীর্ঘ চিঠি আদান-প্রদান করেন, যা *তাজকিরাতুর রশিদে* বিদ্যমান।(১) শেষ পর্যন্ত তা নাজায়েজ হওয়ার বিষয়ে তারও বক্ষ উন্মোচন হয়ে যায়। ফলে তিনি মিলাদ নাজায়েজর পক্ষে যে কাজ আনজাম দিয়েছেন, তা কোন আকাবির দিতে সক্ষম হননি।(২)

দেওবন্দি মতাদর্শ হল, কুরআন-হাদিসের সমন্বয়ক একটি রূপ, যা প্রচলিত অন্যান্য মতাদর্শ থেকে স্বতন্ত্র একটি মতাদর্শ বা চিন্তাধারা। কিন্তু ধীরে ধীরে আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্য হারাতে যাচ্ছি! কারণ কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের ওপর দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে, তারা স্বীয় নীতিমালা থেকে ধীরে ধীরে দূর সরে যায়। তারা ধর্মে শিথিল এবং কর্মে ঢিলা হয়ে যায়।

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু বলেন: হজরত মাওলানা মনজুর নুমানি রাহিমাহুল্লাহ (৩) যিনি দারুল উলুম দেওবন্দের মজলিসে শুরার সদস্য ছিলেন, তার প্রস্তাবে-ই দারুল উলুম দেওবন্দে আমার

---

(১) দেখুন: তাজকিরাতুর রশিদ, ১/১২৪-১৩৬, আশেক এলাহি বুলন্দশহরি।

(২) দেখুন: ইমদাদুল ফাতাওয়া (কিতাবুল বিদআত), ৫/২৪৯-২৫৭, জাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ, ফতোয়া মাওলিদ শরিফ, পৃ. ১১২-১২৬, রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি, মাকতাবাতু হক বোম্বে। আরো পড়ুন: ইখতিলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুসতাকিম, পৃ. ৯২-১০৫, শহিদে মিল্লাত মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভি রাহিমাহুল্লাহ।

(৩) মৃত্যু: ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ।

নিয়োগ হয়। তিনি আমাকে অফুরান ভালোবাসতেন, আমাদের পরস্পর ছিল গভীর সম্পর্ক। তিনি সারাটা জীবন বেরলভিদের মুখোশউন্মোচনে নিজেকে সোপর্দ করেছিলেন। বেরলভিদের রন্ধ-শিরা সম্পর্কে তিনি ছিলেন অবগত। প্রথমদিকে বেরলভিদের ঘাঁটি রায়বেরেলি থেকে তিনি মাসিক *আলফুরকান* প্রকাশ করতেন। তো তিনি আমাকে আজ থেকে আনুমানিক ত্রিশ বছর আগে বলেছিলেন যে, *এখন দেওবন্দি এবং বেরলভিদের মধ্যে মাত্র এক বিঘত পার্থক্য বাকি আছে। অতি শীঘ্র তাও আর থাকবে না!* মানে সকল দেওবন্দি বেরেলভি হয়ে যাবেন! অর্থাৎ বেরলভিরা তাদের নীতি-আদর্শ থেকে দ্বাদশাংশও সরে দাঁড়ায়নি, বরং দেওবন্দিরা স্বীয় নীতিমালা থেকে সরে তাদের দিকে উপনীত হয়েছেন।(১)

(১) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে, পৃ. ২।

আমরা কোথায়?

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু আফসোস করে বলেন: আমি বলব, এখন দেওবন্দিরা বেরেলভিদের কোলে উঠে বসেছেন! তারা স্বীয়-নীতিমালায় পর্বতের ন্যায় অটল ও অবিচল আছে। কিন্তু আমরা নিজেদের রীতিনীতি জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের দিকে ধাবিত হচ্ছি!– এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক কথা!(১)

মূলনীতি থেকে সরে দাঁড়ানো

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু বলেন: দেওবন্দিদের বৈশিষ্ট্য হল, আমবিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং আউলিয়ায়ে কেরামের কবরের যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করা। তাদের ব্যাপারে প্রত্যেক ধরনের শিথিলতা ও সীমালঙ্ঘন থেকে বেঁচে থাকা। কিন্তু এখন আমরাও ওয়ালিদের কবরের সাথে এমন আচরণ শুরু করেছি, যা বিদআতের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।(২)

কবরে নেইমপ্লেট ব্যবহার করা

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু লিখেন: দুঃখজনক সত্য যে, বর্তমানে আকাবিরদের কবরে নেইমপ্লেটের ব্যাবহার রেওয়াজে পরিণত হয়ে গেছে। অথচ একটি *সহিহ হাসান* হাদিস রয়েছে, যাতে কবরে নেইমপ্লেট লাগাতে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।(৩)

হজরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করতে, এর

---

(১) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে, পৃ. ২।

(২) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে, পৃ. ২।

(৩) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে, পৃ. ২।

উপর লিখতে, বিল্ডিং বানাতে এবং কবর পদদলন করতে নিষেধ করেছেন।(১)

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেন: ব্যাখ্যাকারীরা বলেন: কবর পাকা করা, এতে নেইমপ্লেট লাগানো এবং এর উপর মিনার বানানো নিষিদ্ধ, সম্মানের কারণে। আর কবর পদদলিত করা নিষিদ্ধ, অসম্মানের কারণে। কবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে একেবারে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। আবার একেবারে হেয় প্রতিপন্ন করাও উচিত নয়। মধ্যপন্থার আচরণ কাম্য। আমার কাছে নিষিদ্ধতার আরেকটি কারণও রয়েছে। আর তা হচ্ছে, কবরস্থান বারবার ব্যবহার হওয়া উচিত। এখন যদি কবর পাকাকরণ হয়, উপরে নেইমপ্লেটও লাগানো হয়, তাহলে তো সেই জায়গা রিজার্ভ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা জায়েজ হবে না। যদি এমন না হয়, তাহলে কিছু দিন পর কবরের চিহ্ন মিটে যাবে। ফলে ফের তা দাফনের কাজে ব্যবহার হতে পারবে।

মক্কা মুআজ্জামার *জাহুন* এবং মদিনা মুনাওয়ারার *বাকি* (২) কবরস্থান হল ইসলামের পূর্বযুগের। এতে কোটি কোটি মানুষ সমাধিত, আজও সমাহিত হচ্ছেন। সেখানকার নিয়ম হল, এক প্রান্ত থেকে কবরস্থ করে করে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া, শেষ সীমানায় উপনীত হলে প্রথমদিক থেকে আবার শুরু করা। এভাবেই তা বারবার ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু হিন্দুস্তানে মুসলমানদের পুরাতন শহরে চতুর্দিকে কবরস্থান আর কবরস্থান! কবর যখন পাকা হয়ে-ই গেল এবং নেইমপ্লেট লাগানো হল, তো দ্বিতীয়বার ব্যবহার হতে পারে না। সুতরাং এর জন্য অন্য জায়গা কিনতে হয়।

পুরাতন কবরস্থান দেখবালের কেউ না থাকায় এতে পশুদল চরে, মানুষ মলত্যাগ করে! এটা ভালো নাকি দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা? বসতি

---

(১) সুনানে তিরমিজি: ১০৫২।

(২) বাকিউল গারকাদ মদিনার কবরস্থানের নাম, জান্নাতুল বাকি ভুল প্রচলন।

বাড়ছে-ই, তাহলে বাড়বে কোন দিকে? চারদিকে-ই তো বাড়বে। তখন কবরস্থান দিয়ে সড়ক বানানো হবে এবং মানুষ অবৈধভাবে দখল করে ঘরবাড়ি তৈরি করবে। মৃতদের সম্ভাব্য মানহানি হবে-ই। সুতরাং একটি কবরস্থান বারবার ব্যবহার হওয়া এবং যেখানে মানুষের যাতায়াত অব্যাহত থাকায় এর রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব। তবুও কি তা উত্তম নয়? কিন্তু হিন্দুস্তানের মুসলমানরা এ কথা বুঝে-ই না! তারা সব কিছু করতে রাজি। কিন্তু দ্বিতীয়বার কবরস্থান ব্যবহার করতে রাজি নয়। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সমঝ-বুঝ দান করুন।(১)

শাইখ আবদুর রহমান বিন আবদুর রহিম মুবারকপুরি রাহিমাহুল্লাহ (২) এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন: আবুত তায়্যিব সিনদি *শরহে তিরমিজিতে* বলেছেন যে, হাদিসে উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞা যে কোন ধরনের লেখা নিষিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। যেমন: কবরবাসীর নাম, মৃত্যুসন অথবা কুরআনের কোন অংশ বা আল্লাহ তাআলার নাম ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা, বরকত লাভের জন্য। পদদলিত হওয়া বা তা খসে জমিনে পড়ে পিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকার কারণে তা নিষিদ্ধ।

হাকেম রাহিমাহুল্লাহ *আলমুসতাদরাকে* এই হাদিস নকল করে বলেন: এর সনদ সহিহ। কিন্তু এর ওপর উম্মাহর আমল নেই। পূর্ব-পশ্চিম প্রান্তের মুসলিম ইমামগণ কবরে লিখে আসছেন।– এটা এমন বস্তু, যা পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের থেকে গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ *মুখতাসারে* এ কথা বলে তার বিরোধিতা করেছেন যে, তা নব-উদ্ভাবিত। তাদের কাছে হাদিস পৌঁছেনি। শাওকানি রাহিমাহুল্লাহ *নাইলুল আউতারে* বলেন: এই হাদিস দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, কবরে লিপিবদ্ধ করা হারাম। বাহ্যিক

(১) তুহফাতুল আলমায়ি শরহে সুনানে তিরমিজি, ৩/৪৬৩, মুফতি সাইদ আহমাদ পালনপুরি, মাকতাবায়ে হিজাজ দেওবন্দ।

(২) মৃত্যু: ১৩৫৩ হিজরি।

এ দ্বারা মৃত ব্যক্তির নাম ইত্যাদি লেখার মধ্যে অভিন্নতা প্রমাণিত হয় না।

ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি মক্কায় ইমামগণকে কবরে নির্মিত বিল্ডিং ভেঙ্গে দেয়ার নির্দেশ দিতে দেখেছি। আলি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাদিস এ কথা প্রমাণ করে। শাওকানি রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেন, এই হাদিস থেকে কবরের উপর বসা হারাম এ কথা সাব্যস্ত হয়। এটা সংখ্যাগরিষ্ঠদের মত।(১) শাইখ মুহাম্মাদ আশরাফ আজিমাবাদি (২) বলেনঃ এই হাদিস দ্বারা কবরের উপর লেখা মাকরুহ প্রমাণিত হয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে কবরে মৃত ব্যক্তির নাম ইত্যাদি লেখার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।(৩)

অন্য হাদিসে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাকা কবর ভেঙ্গে সমতল করে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। আবু ওয়ায়েল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবুল হাইয়াজ আসদিকে সম্বোধন করে বলেছিলেন যে, আমি তোমাকে এমন কাজের জন্য পাঠাচ্ছি, যে কাজে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রেরণ করেছিলেন। আর তা হল সমস্ত উচুঁ কবর সমতল করে ছাড়বে এবং সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে ফেলবে।(৪)

---

(১) তুহফাতুল আহওয়াজি শরহে সুনানে তিরমিজি, ৪/১৩৩, আশরাফিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ।

(২) মৃত্যুঃ ১৩২৯ হিজরি।

(৩) আউনুল মাবুদ, ৯/৩৩, দারুল কুতুবিল ইসলামিয়া বৈরুত।

(৪) সুনানে তিরমিজিঃ ১০৪৯।

উলামা-তলাবাদের সমীপে একটি আর্জি

শাইখ আবদুর রহমান মুবারকপুরি রাহিমাহুল্লাহ উল্লিখিত হাদিসের ব্যাখায় লিখেছেন: উলামায়ে কেরাম বলেন যে, কবর এক হাত থেকে উচুঁ করা মুসতাহাব এবং এরচে বেশি করা মাকরুহ। কেউ এমনটা করলে ভেঙ্গে ফেলা মুসতাহাব। কতটুকু ভাঙ্গবে? এর মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, ক্রোধবশত জমি পর্যন্ত ভেঙ্গে ফেলবে। তা হাদিসে উল্লিখিত *তাসবিয়াহ* শব্দের কাছাকাছি অর্থে।

আর ইবনুল হুমাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যারা বিল্ডিং বানিয়ে কবর উঁচু করেন, হাদিসটি তাদের ব্যাপারে। কবর সমতল করা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য তা নয়, বরং যতটুকু জমি থেকে উঁচু এবং পৃথক হয়, তা অভীষ্ট। *মিরকাতে* এমনই রয়েছে।

শাওকানি রাহিমাহুল্লাহ *নাইলুল আউতারে* বলেন: *যে কবর উঁচু পাবে, তা সমতল করে দিবেন* এ থেকে বুঝা যায় যে, সুন্নাহ হল: কবর বেশি উঁচু না হওয়া, যাতে সম্মানিত-অসম্মানিত মানুষের মধ্যে পার্থক্য না হয়। এ কথা তো স্পষ্ট যে, অনুমোদিত পরিমাণ থেকে কবর উঁচু করা হারাম। ইমাম আহমাদের অনুসারীগণ, এক দল শাফেয়ি এবং মালেকিরা এ কথা বলেছেন। মিনার এবং কবরের উপর নির্মিত দৃশ্যপট হাদিসের প্রথম বহনস্থল।

এমনিভাবে কবরে মসজিদ বানানো। অথচ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কাজ সম্পাদনকারীর ওপর অভিশম্পাত করেছেন। কবরের উপর মিনার-বিল্ডিং বানানো: কবর উচুঁ করার নামান্তর, যা হাদিসের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। আর তা কবরকে মসজিদে রূপান্তর করার অন্তর্ভুক্ত। এমন ব্যক্তির ওপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ দিয়েছেন। কবর-পূজারীদের মনোবাসনা ও মনপছন্দ কত অপকর্ম বিস্তার করছে, যার জন্য ইসলাম রোদন করছে! এর মধ্য থেকে একটি হল, কবরের প্রতি জাহেলদের আকিদা-বিশ্বাস: ভূতের প্রতি কাফেরদের বিশ্বাসের ন্যায়, বরং এরচেও

ভয়ঙ্কর হল যে, তারা বিশ্বাস করে যে, এ সব ভূত তাদের থেকে সকল বিপদাপদ দূর করতে এবং ফায়দা পৌঁছাতে সক্ষম। ফলে তারা কবরকে-ই নিজেদের চাওয়া-পাওয়ার স্থান বানিয়ে নিয়েছে। একে মনের কথা বলার আশ্রয়স্থল বানিয়ে নিয়েছে। তারা তাদের কাছে এমনভাবে প্রার্থনা করে, যেমন বান্দা তার রবের কাছে প্রার্থনা করে। তারা কবরের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করে, কবর মুছে এবং কবরে সাহায্যের আবেদন করে।

মোটকথা, মূর্খতার যুগে ভূতের সাথে যা করা হত, এর কিছু-ই তারা ছাড়েনি। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! এতদসত্ত্বেও ভয়ানক এই কুসংস্কার ও ভীতিকর কুফরির কারণে আল্লাহর জন্য ক্রুদ্ধ হতে এবং একনিষ্ঠ দীনের সাহায্যে এগিয়ে আসতে কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না! না কোন আলেমকে, না কোন ছাত্রকে, না কোন আমিরকে এবং না কোন মন্ত্রী বা সরকারকে...। তাদের এমন কর্মকাণ্ড এ কথার স্পষ্ট দলিল যে, তাদের শিরিক ঐ ব্যক্তির শিরিক থেকেও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে যে বলে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা দুয়ের এক বা তিনের এক!

ওহে দীনের উলামায়ে কেরামগণ! ওহে মুসলিম সরকার প্রধানেরা! ইসলামে কুফর থেকে মহাবিপদ কী হতে পারে? আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্যের এবাদতের চেয়ে বিপজ্জনক কী আছে? মুসলামানদের ওপর আগন্তুক এরচে বড় বিপদ কী আছে, যা এই বিপদের সমপরিমাণ! এমন সুস্পষ্ট শিরকের অস্বীকৃতি যদি ওয়াজিব না হয়, তাহলে কোন গুনা বা অন্যায়ের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা ওয়াজিব ? (১)

---

(১) তুহফাতুল আহওয়াজি, ৪/১২৮, আবদুর রাহমান মুবারকপুরি, আশরাফিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ।

মাজার: উলামায়ে দেওবন্দ এবং বেরলভিদের অবস্থান

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু বলেন: বেরলভিয়াত তথা মাজারপূজারীদের থেকে দেওবন্দি মতাদর্শকে পার্থক্যকারী বস্তুগুলোর অন্যতম একটি হচ্ছে মাজার। তারা মাজারকে-ই সব কিছুর মূলমন্ত্র মনে করে থাকে, তারা ওয়ালিদের পূজা করে এবং তাদের কবরে সাজদা করে। তারা ওয়ালিদের নামে মানত করে, কবর পাকা করে এবং কবরে চাদর চড়ায়। তারা মাজারে ধ্যানে বসে, বাবার কাছে কামনা করে, মাজারের উদ্দেশ্যে ভ্রমন করে এবং কবর থেকে সরাসরি ফুয়ুজ অর্জনের বিশ্বাসসহ নানান অপকাণ্ড তারা করে থাকে!(১)

পবিত্র কুরআনে কারিমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন: "তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তাআলাকে ব্যতিরেকে এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের এবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তারা তার শরিক সাব্যস্ত করে। অথচ তিনি এ থেকে পবিত্র।"(২)

কিন্তু দেওবন্দি চিন্তাধারায় এ সবের কোন সুযোগ নেই। কখনো থাকতেও পারে না। অথচ আফসোসজনক সত্য যে, বর্তমানে আমরা দেওবন্দিরা মূল দেওবন্দিয়াতে নেই! দূরে ছিটকে যাচ্ছি! বেরলভিয়াতের স্রোতে ভাসছি এবং তাদের দিকে ধাবিত হচ্ছি!(৩)

কবরে নেইমপ্লেট লাগানোর হুকুম

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু লিখেন: আমি যখন দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে পড়াশোনা শেষ করে শিক্ষকতার জন্য গুজরাটের সুরাটে রওয়ানা করি, তখন কাসেমি কবরস্থানে কোন নেইমপ্লেট ছিল

---

(১) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে: বয়ান থেকে (কমবেশির সাথে)।

(২) সুরা তওবা: ৩১।

(৩) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে: বয়ান থেকে।

না। আগে কাসেমি কবরস্থান, হজরত গাঙ্গুহি রাহিমাহুল্লাহুর কবর এবং থানভি রাহিমাহুল্লাহুর কবরেও কোন নেইপ্লেট ছিল না বলে আমার এখনো মনে আছে। কিন্তু চার-পাঁচ বছর পর যখন উসতাজ হয়ে প্রত্যাবর্তন করি, তখন কয়েকটি কবরে নেইমপ্লেট নজরে আসে! দেখতে দেখতে অনেক কবরে তা লেগে যায়। এখন তো কাসেমি কবরস্থানে গেলে তা খ্রীস্টানদের কবরস্থানের মতো মনে হয়! বর্তমানে যে যত বড় আলেম, তার কবরে তত বড় নেইমপ্লেট! ধীরে ধীরে নতুন কবর দেয়ার স্থানটুকুও আর বাকি থাকবে না! অথচ কবর পাকা করা এবং নেইমপ্লেট লাগানো সম্পূর্ণ হারাম এবং নিষিদ্ধ। হাদিস শরিফে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ থেকে নিষেধ করেছেন।(১)

বুজুর্গদের কবর উচুঁ করা বিদআত

প্রসিদ্ধ তাফসির *আলমাজহারি* গ্রন্থকার কাজি সানাউল্লাহ পানিপথি রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ১২২৫ হিজরি) বলেন: ওয়ালি-বুজুর্গদের কবর উচুঁ করা, গম্বুজ বানানো, ওরস করা এবং বাতি জ্বালানো– এ সব কাজ বিদআত। এর কোনটি হারাম, আবার কোনটি মাকরুহ। কবরে বাতি প্রজ্বলনকারীদের ওপর এবং সাজদাকারীদের ওপর আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করে বলেছেন যে, আমার কবরকে মসজিদ বানাবে না, যেখানে সাজদা করা হয়। উৎসবও বানাবে না: মানুষ সমবেত হওয়ার নির্ধারিত দিন। আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এ উদ্দেশ্যে-ই পাঠিয়েছিলেন। তিনি যেন সমস্ত উচুঁ কবর সমতল করে দেন এবং যেখানে-ই কোন মূর্তি দেখতে পান, ভেঙ্গে দেন।(২)

আজ আমরা দেওবন্দি হওয়া সত্ত্বেও বুজুর্গদের কবর পাকা করছি না? কবরে টাইল লাগাচ্ছি না?

---

(১) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে, পৃ. ৩।

(২) ইরশাদুত তালেবিন, পৃ. ২০।

শহিদে মিল্লাত মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: এখন এ সব কার্যকলাপের পর্যবেক্ষণ করে দেখুন, আমাদের সাধারণ অজ্ঞ লোকেরা ওয়ালিদের কবরে কী কী করছে? যেমন: কবরে আচ্ছাদনি দেয়া, বাতি জ্বালানো, সাজদা করা, তওয়াফ করা, চুম্বন করা, এতে কপাল-চোখ মালিশ করা এবং তাদের সামনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা। নামাজে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে থাকার ন্যায়। তাদের সামনে রুকুর ন্যায় ঝুঁকে থাকা, তাদের নামে মানত করা এবং উপঢৌকন দিয়ে স্তুপ করা। ঘটনাক্রমে আপনি যদি কোন বুজুর্গের মাজারে গিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি এই সমস্ত দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে অনায়াসে দেখতে পাবেন। অথচ আমাদের আহলে সুন্নাত এবং উলামায়ে আহনাফের কিতাবে এ সব সমস্ত কার্যাকলাপকে নাজায়েজ লেখা হয়েছে।(১)

কবর চতুর্ভুজ বা পাকা করা

কবর চতুর্ভুজ করা বা পাকা করা নিষিদ্ধ। অথচ আমরা বুজুর্গদের কবর দেদারসে পাকা করছি! যেন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী বেমালুম ভুলে গেছি! কবর পাকা করা নিষেধের ব্যাপারে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসসমূহ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এই নববি বাণীর আলোকে তা হারাম হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ। তিনি ছিলেন ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহুর ছাত্র এবং তার মাজহাবের সঙ্কলক। তিনি বলেন: কবর থেকে বেরকৃত মাটি থেকে অতিরিক্ত মাটি ঢালাকে আমরা বিশুদ্ধ মনে করি না এবং আমরা কবর পাকা করাকে এবং একে প্লাস্টার করাকে অপছন্দনীয় মনে করি। কবরকে চতুর্ভুজ করতে এবং পাকা করতে নবি

---

(১) ইখলিতাফে উম্মত আওর সিরাতে মুসতাকিম, পৃ. ৭৮, শহিদে মিল্লাত মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভি রাহিমাহুল্লাহ, হাকিমুল উম্মত প্রকাশনী ঢাকা। আরো দেখুন: ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৫/৩০৩।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। সুতরাং এটা-ই আমাদের মাজহাব। এটা-ই ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহুর বক্তব্য।(১)

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: যেহেতু নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রতিটি উঁচু কবর ভেঙ্গে সমতল করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তো ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি মক্কা মুকাররমায় শাসকদেরকে (এই) হাদিস অনুযায়ী কবরে নির্মিত বিল্ডিংসমূহ ভেঙ্গে দেয়ার নির্দেশ দিতে দেখেছি।(২)

কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী আমরা দেওবন্দিরা কি তৈরিকৃত কবরগুলো মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারি না?

(১) কিতাবুল আসার, পৃ. ৯৬, রদ্দুল মুহতার, ২/২৩৭।

(২) আলমিনহাজ শরহে সহিহ মুসলিম, ১/৩১২।

মিনার বা খিলানযুক্ত ছাদ নির্মাণ

শহিদে মিল্লত মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, ওয়ালিদের মাজারে যেসব গম্বুজ এবং খিলানযুক্ত ছাদ নির্মিত হয়েছে, তা থেকে আকাবিরগণ সম্পূর্ণ দায়মুক্ত। কারণ তারা এমন কর্ম পছন্দ করতেন না, না এর অনুমতি দিয়েছেন এবং এমনটা করতে ওসিয়তও করেননি। এর দায়ভার ঐ সমস্ত দুনিয়াদার রাজা-বাদশাদের ওপর বর্তাবে, যারা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত বাণীর বিরোধিতা করে এমন ভ্রষ্ট কার্যকলাপ বহাল রেখেছিলেন।

বর্তমানে তো কবর পাকা করা এবং এর উপর নয়নাভিরাম রওজা নির্মাণ করাকে ওয়ালি হওয়ার মাপকাঠি মনে করা হয়! এমন অনেক ঘটনাবলী আপনার জ্ঞানে থাকবে যে, কোন কবর ব্যবসায়ী স্বপ্নে অথবা ইলহামের রেফারেন্সে কোন জায়গায় বানোয়াট মাজার বানিয়ে ফেলে এবং মানুষও এর পূজা শুরু করে দেয়! ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! যাই হোক হানাফি মাজহাবের নির্ভরযোগ্য সমস্ত কিতাব যেমন: আলমগিরি, কাজিখান, সিরাজিয়া, আদ্দুররুল মুখতার এবং কাবিরি ইত্যাদিতে এমন কার্যকলাপকে অবৈধ লেখা হয়েছে।(১)

আল্লামা ইবনে আবেদিন শামি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আমি এমন কাউকে দেখিনি, যে কবরের উপর প্রাসাদ নির্মাণ করার বৈধতাকে পছন্দ করেছেন।(২) কাজি সানাউল্লাহ হানাফি পানিপথি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ওয়ালিদের কবরে যে সব উঁচু উঁচু বিল্ডিং বানানো হয়, বাতি

---

(১) ইখলিতাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকিম, পৃ. ৭৯, তুহফাতুল কারি, ৩/৪৬৪।

(২) রদ্দুল মুহতার, ২/২৩৭।

প্রজ্বলন করা হয় এবং এ ধরনের যেসব কার্যকলাপ করা হয়, তা সবই হারাম।(১)

হাকিমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রাহিমাহুল্লাহ বিদআত এবং কুসংস্কারের আলোচনায় বলেছেন: কবরে আড়ম্বনার সাথে মিলাদ করা, বাতি জ্বালানো, নারীদের সেখানে যাতায়াত করা, চাদর চড়ানো, কবর পাকা করা, বুজুর্গদের সন্তুষ্টির জন্য কবরের প্রতি সীমাহীন সম্মান প্রদর্শন করা, মাতম করা, কবরে চুম্বন করা, কবরের মাটি শরীরে লাগানো, কবরে সাজদা করা, কবরের দিকে নামাজ পড়া, মিষ্টি, এতে চাউল ইত্যাদি ছিটানো, শোকপতাকা বা এ জাতীয় কিছু রাখা এবং এতে হালুয়া-মালেদা ছিটানো ইত্যাদি কাজ বিদআত এবং কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত।(২)

এ যুগে মুশরিকদের নমুনা

আল্লাহ তাআলা না করুক! আমাদের অবস্থা কবরপূজারীদের মতো হয়ে যাচ্ছে না তো? কারণ এ কালে মুশরিকদের নমুনা উল্লেখ করতে গিয়ে মুসনিদুল হিন্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন: যদি আপনি মুশরিকদের আকিদা-বিশ্বাস, আমল এবং অবস্থা সম্পর্কে অনবগত হয়ে থাকেন, তাহলে বর্তমান যুগের পেশাদারীদের দিকে লক্ষ্য করুন। বিশেষত তাদের মধ্য থেকে যারা দারুল ইসলামের সীমান্ত এলাকায় বসবাস করে। বেলায়েত সম্পর্কে তাদের ধারণা-ই বা কী!? তারা পূর্ববর্তী ওয়ালিদের বেলায়েতের কথা স্বীকার করে থাকে। কিন্তু বর্তমান যুগে ওয়ালিদের বিদ্যমানতাকে অসম্ভব মনে করে। তারা কবর এবং গোবরাটের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করে এবং তারা নানা রকম শিরকে লিপ্ত হয়ে থাকে। লক্ষ্য করুন! কীভাবে তাদের মধ্যে তাশবিহ-তাহরিফের অনুপ্রবেশ ঘটেছে! আমরা তো তাদের মধ্যে সেই সহিহ হাদিসের বাস্তব রূপ

---

(১) মালা বুদ্দা মিনহু, পৃ. ৬৭, মাকতাবাতুল হেরা ঢাকা।

(২) বেহেশতি জেওর, পৃ. ৬৫, ইসলামিয়া কুতুবখানা ঢাকা।

দেখতে পাচ্ছি: *নিশ্চয় তোমরা পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।*(১) তাদের এমন কোন আকিদা-বিশ্বাস নেই, যা বর্তমান যুগের কোন না কোন একটি দল বিশ্বাস করেনি বা কর্মে পরিণত করেনি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন।(২)

বর্তমান যুগে ইহুদিদের নমুনা

আমাদের অনেক ভাই-বেরাদর এই নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে γাত হওয়া সত্ত্বেও মানতে রাজি নয় বা তা আমলে আনতে সঙ্কোচবোধ করেন। এমনটা ঠিক নয়। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি রাহিমাহুল্লাহ বর্তমানযুগে অভিশপ্ত ইহুদিদের নমুনা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন: সর্বাবস্থায় যদি তুমি ইহুদিদের দৃষ্টান্ত দেখতে চাও, তাহলে উলামায়ে সুয়ের দিকে তাকাও। যারা দুনিয়া অন্বেষণকারী, বাপ-দাদার অনুকরণপ্রিয়, কিতাব-সুন্নাহর দলিল-বিমুখী, তারা কোন আলেমের কঠোরতা এবং তার গভীর চিন্তা-ভাবনা অথবা তার মন-পছন্দের ওপর নির্ভরশীল। ফলে তারা নিষ্পাপ শরিয়ত-প্রণেতার কথা এড়িয়ে চলে এবং বানোয়াট হাদিস, ফাসেদ তাবিলাত এবং ব্যাখ্যাকে অনুসরণীয় মনে করে! দেখে নাও, ওরা যেমন তারা-ই!(৩)

---

(১) সহিহুল বুখারি: ৭৩২০।

(২) আলফাউজুল কাবির, পৃ. ১৯, তারিব-তালিক: মুফতি সাইদ আহমদ পালনপুরি, মাকতাবাতুল হেরা ঢাকা।

(৩) আলআউনুল কাবির শরহুল ফাওজিল কাবির, পৃ. ৭০, মুফতি সাইদ আহমাদ পালানপুরি, মাকতাবায়ে হিজাজ দেওবন্দ।

ভয়ঙ্কর ফিতনা!

যেসব ওয়ালি-বুজুর্গদের কবর আমরা পাকা করেছি, তা ভেঙ্গে ফেলা আমাদের ওপর আবশ্যক। হাফেজ ইবনুল কায়্যিম আলজাওজিয়া (মৃত্যু: ৭৫১ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ বলেন: শয়তান মুশরিকদের জন্য যা কিছু তৈরি করেছে, তন্মধ্য থেকে একটি হল, কাষ্ঠখণ্ড। আর গাছ, খুঁটি, মূর্তি, কাষ্ঠখণ্ড ইত্যাদি ধুলিস্যাৎ করে দেয়া এবং এর চিহ্ন মিটিয়ে দেয়া ওয়াজিব। যেমনিভাবে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সমস্ত উঁচু কবর বিদীর্ণ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ তার *সহিহে* আবুল হাইয়াজ আসদি থেকে নকল করেছেন। তিনি বলেন যে, আমাকে আলি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন: জেনে রেখো! আমি তোমাকে এমন কাজের জন্য প্রেরণ করছি, যে কাজে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রেরণ করেছিলেন। আমি যেন মূর্তি পেলে ভেঙ্গে দিই এবং উঁচু কবর সমতল করে দিই।

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নির্দেশে সাহাবায়ে কেরামগণ হজরত দানিয়াল আলাইহিস সালামের কবর গোপন করেছিলেন। এমনিভাবে যখন তার কাছে সংবাদ পৌছল যে, মানুষ ঐ গাছের নিচে বিলাপ করে, যার তলদেশে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। তখন তিনি লোক পাঠিয়ে একে কর্তন করে দিলেন...।

উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন গাছের সাথে এমন আচরণ করেছেন, যার আলোচনা আল্লাহ তাআলা কুরআনে করেছেন, যার তলদেশে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত হয়েছিলেন। তাহলে অন্যান্য কাষ্ঠখণ্ড ও মূর্তি-প্রতিমাদের হুকুম কী হবে? যদ্দারা ফিতনা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করছে এবং বিপদ বাড়ছে-ই! এরচে গুরুত্বহ

কথা হল যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে জেরার ভেঙ্গে সমতল করে দিয়েছেলেন। এতে এরচে ভয়ঙ্কর ফসাদ সৃষ্টিকারী বস্তু ধ্বংস করার দলিল রয়েছে। যেমন: সেসব মসজিদ, যা কবরের উপর নির্মিত। কেননা এ সব ভেঙ্গে দেয়া ইসলামের নির্দেশ। এমনকি একে মাটির সাথে সমতল করে দেয়া। তা ভেঙ্গে ফেলা মসজিদে জেরার থেকে অধিক যুক্তিসঙ্গত। এমনিভাবে যে সমস্ত মিনার কবরের উপর নির্মিত, তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া আবশ্যক। কেননা তা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করে বানানো হয়েছে, যা সম্মানের অনুপযুক্ত। তা নিজের মালিকানাধীন নির্মিত বস্তু ভেঙ্গে দেয়া থেকেও বেশি উপযুক্ত। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কবর ভেঙ্গে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন, যা উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

অতএব, কবরের উপর নির্মিত খিলান, বিল্ডিং এবং মসজিদ ভেঙ্গে দেয়া উত্তম এবং অধিক উপযুক্ত। কেননা তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে মসজিদ তৈরিকারীর ওপর অভিসম্পাত করেছেন এবং এর উপর বিল্ডিং বানাতে নিষেধ করেছেন। অতএব, যে কর্মের কর্তার ওপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন এবং যা থেকে তিনি বারণ করেছেন, তা ভেঙ্গে দেয়ার প্রতি অগ্রগামী হওয়া এবং এতে আপ্রাণ চেষ্টা করা ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তি প্রস্তুত করে দিন, যারা তার দীন এবং রসুলের সুন্নাতের সাহায্য এবং প্রতিরক্ষা করবে।(১)

---

(১) ইগাসাতুল লাহফান মিন মাসায়িদিশ শাইতান, ১/২১০, ইবনুল কায়্যিম, মাকতাবাতুল মাআরিফ রিয়াদ। আরো দেখুন: মাকালাতুল কাওসারি, পৃ. ১৩৫, দারুল ইমান সাহারানপুর। হাফেজ ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ *জাদুল মাআদ ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদ* ১/৪৮৪ এ লিখেছেন:

ولم يكن من هديه صلي الله عليه وسلم تعلية القبور ولا بناؤها بآجر، ولا بحجر ولا لبن، ولا تشييدها، ولا تطيينها، ولا بناء القباب عليها، فكل هذا بدعة مكروهة، مخالفة لهديه صلي الله عليه وسلم وقد بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن.... وكانت قبور أصحابه لا مشرفة ولا لاطئة، وهكذا

ফিকহের দৃষ্টিতে নেইমপ্লেটের ব্যবহার

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু লিখেন: হ্যাঁ, ফিকহের কিতাবসমূহে লেখা আছে যে, বড়দের কবরে লেখা যাবে। কিন্তু বড় কে? এর ফয়সালা করবে কে? আত্মীয়-স্বজন এবং পরিবার-পরিজনের কাছে তাদের মরহুম-ই তো বড়!(১)

হাকেম মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ নিশাপুরি (মুত্যু: ৪০৫ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ হজরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাদিস উল্লেখ করে বলেন: এর সমস্ত সনদ সহিহ। কেননা পূর্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত মুসলিম ইমামদের কবরে নেইমপ্লেট রয়েছে। এটা এমন আমল, যা পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের থেকে গ্রহণ করেছেন।(২) কিন্তু ইমাম জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ তার বিরোধিতা করে বলেন: কোন সাহাবি এমন করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। এটা এমন বস্তু, যা তাদের পরে কিছু তাবেয়িগণ উদ্ভাবিত করেছেন। কারণ তাদের কাছে নিষেধাজ্ঞার হাদিস পৌঁছেনি।(৩)

যদিও শাইখ আবদুল হক বিন সাইফুদ্দিন দেহলভি (মৃত্যু: ১০৫২ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ কবর পাকা করাকে জায়েজ লিখেছেন। কিন্তু ইমামুল আসর মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশমিরি রাহিমাহুল্লাহ তার বিরোধিতা করে বলেন: কবর প্লাস্টার করা বা বিল্ডিং বানানো কারো

كان قبره الكريم، وقبر صاحبيه، فقبره صلى الله عليه وسلم مسنم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء لا مبني ولا مطين، وهكذا كان قبر صاحبيه

(১) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে, পৃ. ৩।

(২) আলমুসতাদরাকু আলাস সাহিহাইন, ১/৫২৫, হাদিস: ১৩৭০, তাহকিক: আবদুল কাদির আতা, প্রথম প্রকাশন।

(৩) মুখতাসারু তালখিসিস জাহাবি, ১/২৯১, হাদিস: ৮৫, ইবনুল মুলাককিন বিরচিত।

মতে জায়েজ নয়। শাইখ আবদুল হক দেহলভি রাহিমাহুল্লাহ *মাদারিজুন নবুওয়ায়* আমাদের কিছু মাশায়েখ (মুহাম্মদ বিন সালামা) থেকে এর যে বৈধতা প্রমাণ করেছেন, ইবনে সালামার বক্তব্য সরাসরি নিরীক্ষণ করা উচিত। আর "নেইপ্লেট ব্যবহার করা: আমরা সালাফের কবরে নেইমপ্লেট দেখতে পাই" এ কথা হাদিসের নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন না বহির্ভূত? তা আমার জানা নেই! *আলমুসতাদরাক* গ্রন্থকার হাকেম বলেন: আমরা পূর্ব-পশ্চিম প্রান্তে কবরে নেইপ্লেট দেখতে পাই। অথচ তা লিখতে হাদিস নিষেধ করে। আল্লাহ-ই ভালো জানেন। *তাবাকাতুল মালিকিয়ার* বক্তব্য: শাইখ নাসিরুদ্দিন বিন মুনির *ইবনে হাজিবের* কবরে দুটি কবিতা লিখেছেন। সারকথা হল, আমি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাই না! হাদিস তো ব্যাপক।(১)

ফিকহ: কুরআন-হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক হলে করণীয় কী?

ফিকহের যেসব মাসায়েল সুন্নাহর মুওয়াফিক হবে, তার-ই নাম হচ্ছে দেওবন্দিয়াত। ফিকহের কিতাবে সব ধরনের বক্তব্য রয়েছে। কিন্তু দেওবন্দিরা এসে কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী বক্তব্যগুলো প্রত্যাখ্যান করেছেন। এজন্য ফিকহের অনেক মাসআলা উলামায়ে দেওবন্দ গ্রহণ করেননি। ফিকহের এমন অংশ, যা কুরআন-হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক হবে, সে ক্ষেত্রে বলা হবে যে, তা সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় পশ্চাদ্ভাগে নিক্ষিপ্ত। এর ওপর ফতোয়া দেয়া যাবে না, আমলও করা যাবে না।(২)

হজরতে আকদাস মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রাহিমাহুল্লাহুর মেজাজ এমনই ছিল যে, পরবর্তী ফকিহদের যেসব মাসআলা হাদিসের

---

(১) আলআরফুশ শাজি, ২/৩৪০, তাসহিহ: মাহমুদ শাকের, দারুত তুরাস আলআরাবি, ১ম সংস্করণ ১৪২৫ হিজরি।

(২) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে, পৃ. ৩, দেওবন্দিয়াত কিয়া হে: বয়ান থেকে।

খেলাপ ছিল, তিনি এ থেকে ফিকহে হানাফিকে দায়মুক্ত ঘোষণা করেছেন।([১])

একটি দৃষ্টান্ত

এর একটি দৃষ্টান্ত হল, تثويب এর মাসআলা। পরবর্তী যুগের ফকিহগণ প্রত্যেক ফরজ নামাজের জন্য একে মুসতাহাব হওয়ার কথা লিখেছেন।([২]) কিন্তু আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা একে অস্বীকার করেছেন এবং একে দীনে উদ্ভাবিত এবং এলাকাবাসীকে বিদআতি আখ্যায়িত করেছেন। *সুনানে আবু দাউদে* মুজাহিদ বিন জাবর রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: আমি ইবনে উমরের সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। এক ব্যক্তি জোহর অথবা আসরের সময় তাসভিব করলে তিনি বললেন: আমাকে এই এলাকা থেকে নিয়ে বের হও– ইবনে উমর তখন অন্ধ ছিলেন– কেননা তাসভিব হল বিদআত।(৩)

দেখুন উল্লিখিত তাসভিবকে সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা অস্বীকার করেছেন এবং একে বিদআত আখ্যায়িত করছেন। এজন্য আমাদের ফিকহের কিতাবে এর বৈধতা থাকলেও আমরা দেওবন্দিরা এর ওপর আমলও করি না, এর বৈধতার ফতোয়াও দিই না। হ্যাঁ, অন্যান্যরা এর ওপর আমল করে থাকেন। নেইমপ্লেটের মাসআলার ধরনও ঠিক এরকম। যখন *সহিহ হাদিসে* তা নিষিদ্ধের কথা আছে, তাহলে হাদিসের বিপরীত গিয়ে আমল করার কোন অর্থ হয় না!(৪)

---

(১) দেখুন: বাকিয়াতে ফাতাওয়া রশিদিয়া, পৃ. ৬৭ (ভূমিকা)।

([২]) تثويب: আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে নামাজের জন্য বিশেষ আহবান। আঞ্চলিক ভাষায় হোক বা অন্য কোন ভাষায়।

(২) সুনানে আবু দাউদ: ৫৩৮।

(৪) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে: প্রদত্ত বয়ান।

মাজারের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু বলেনঃ বর্তমানে দেওবন্দি-বেরলভি প্রত্যেকের আলাদা আলাদা মাবুদ (মাজার) রয়েছে। তারা যায় আজমির, নেজামুদ্দিনসহ অন্যান্য দরগায়। নিজেদের মাবুদদের কাছে! আর আমরা যাই কাসেমি কবরস্থান, নানুতা, থানাভবন এবং গাঙ্গুহ ইত্যাদিতে! তারা আমাদের এখানে আসে না, আমরাও তাদের প্রভুদের কাছে যাই না! তারা মাজারে সাজদা করে। আর আমরা মাজারে গিয়ে নতশির হই! ব্যবধান শুধু এটুকু-ই! অতি শীঘ্র মূর্খতার জোয়ারে ভেসে এই নতশির ধাপে ধাপে জমিনে লাগতে শুরু করবে! বর্তমানে অনেক লোক তো স্রেফ মাজারে মাজারে ঘুরছে! এর কারণটা কী!? (১)

কোন ব্যক্তির কথা দলিল নয়

মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রাহিমাহুল্লাহ কবর পাকাকরণের ব্যাপারে বলেনঃ এই সমস্ত কার্যকলাপ নাজায়েজ এবং যেখানে-ই লোকেরা এমনটা করেছে, তারা গ্রহণযোগ্য আলেমদের কেউ নন।

সারকথা, কুরআন এবং সুন্নতে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিপরীত গিয়ে কোন ব্যক্তি কিছু করলে, তা নাজায়েজ এবং অগ্রহণীয় ধর্তব্য হবে। হাদিসে এই সমস্ত কার্যাকলাপের নিষিদ্ধতা এসেছে। অতএব, কারো কর্ম দ্বারা তা জায়েজ হয়ে যায় না। দলিল একমাত্র কুরআন, হাদিস এবং মুজতাহিদদের কথা। কোন ব্যক্তির শরিয়ত-বিরোধী কোন কথা দলিল হতে পারে না। হারামাইনে যেসব কার্যকলাপ কিতাব-সুন্নাহর খেলাপ প্রচলিত হয়ে গেছে, তা জায়েজ হতে পারে না। সেখানে এ সব বিদআত থেকে বাধা না দেয়াও জায়েজের দলিল হতে পারে না। আবার তাদের চুপ থাকার কোন

(১) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে, বয়ান থেকে।

কারণও গ্রহণযোগ্য নয়, বরং কিতাব-সুন্নাহ দ্বারা এর বিরুদ্ধাচরণ করা তাদের ওপর আবশ্যক ছিল।(১)

(১) ফাতাওয়া রশিদিয়া, পৃ. ১৩৪, তালিফাতে রশিদিয়ার সাথে মুদ্রিত।

আকাবিরের অনুসরণ বনাম আকাবির পূজা

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু বলেনঃ আমরা দেওবন্দিরা কবর পাকাকরণের বৈধতার ওপর আমল করি না। এজন্য যে, আকাবিরদের আমল যতক্ষণ না কুরআন, সুন্নাহ এবং তিন স্বর্ণযুগের আমল দ্বারা শক্তিশালী হবে, তা মানা যাবে না। সর্বাবস্থায় আকাবিরদের আমল এবং তাদের বক্তব্য গ্রহণ করা আকাবির পূজার নামান্তর, যা নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। আকাবিরদের অনুসরণ করা চাইঃ অন্ধ অনুকরণ কাম্য নয়।(১)

দীন বিকৃতির একটি আকৃতি

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ দীন বিকৃত হওয়ার একটি আকৃতি হচ্ছে, মাশায়েখদের পছন্দ করা। অর্থাৎ আকাবিরগণ কুরআন-সুন্নাহর খেলাপ গিয়ে কোন বস্তুকে উত্তম বিবেচনা করেছেন বা একে অনুমোদন দিয়েছেন। অতঃপর একে দীন বলে বিশ্বাস করা এবং এর ওপর আমল করা।(২) সুতরাং কোন আকাবির কুরআন-সুন্নাহর বাইরে গিয়ে কোন কিছু করলে তা গ্রহণ করার সুযোগ নেই।

---

(১) দেওবন্দিয়াত কিয়া হেঃ প্রদত্ত বয়ান।

(২) দেওবন্দিয়াত কিয়া হেঃ প্রদত্ত বয়ান।

মাদরাসায় বা মসজিদের পাশে দাফন করা

বর্তমানে আমাদের মধ্যে মাদরাসায় এবং মসজিদের পাশে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার প্রচলন ব্যাপকহারে দেখা যাচ্ছে। অথচ কুরআন-হাদিসের শিক্ষানুযায়ী মসজিদ বা মাদরাসায় দাফন করা অনুচিত।

উসতাজে মুহতারাম কুদ্দিসা সিররুহু লিখেন: এখন দেওবন্দিদের মধ্যেও বুজুর্গদেরকে মসজিদে এবং প্রতিষ্ঠাতাদেরকে মাদরাসায় দাফন করার প্রচলন ব্যাপকহারে বেড়ে গেছে! অথচ হাদিসে এ বিষয়ে পরিষ্কার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। নিজের মালিকানাধীন জায়গায় অথবা আপন গোরস্থানে দাফন করা তো জায়েজ। কিন্তু মসজিদ-মাদরাসা তো কারো মালিকানা নয়। মাদরাসা প্রতিষ্ঠাতার নিজস্ব ওয়াকফ নয়, বরং পাবলিকের চাঁদায় পরিচালিত। তাহলে প্রতিষ্ঠাতাদেরকে মাদরাসায় দাফন করার উদ্দেশ্য-ই বা কী? ওয়াকফকৃত জমিনে এমন করা কি জায়েজ? ভবিষ্যতে যখন ধীরে ধীরে মূর্খতার ছড়াছড়ি হবে, তখন এই কবরে-ই পূজা শুরু হয়ে যাবে! (১)

উসতাজে মুহতারাম কুদ্দিসা সিররুহু আরো লিখেন: হাদিসে যখন স্বীয় ঘরে দাফন করতে নিষেধ করা হল, তাহলে আল্লাহর ঘরে সমাহিত করার অনুমতি কোত্থেকে হবে? যত বড় বুজুর্গ হোন না কেন, তাকে নিজের কবরস্থানে দাফন করতে হবে। ঘরে নয়, মসজিদেও নয় এবং মসজিদসংলগ্ন গার্ডেনেও নয়। কিন্তু ইদানিং এই বিদআত ছড়িয়ে পড়েছে! জামেআ বানুরিয়া করাচিতে মাওলানা ইউসুফ সাহেব বানুরি রাহিমাহুল্লাহুর কবর, কলকাতায় মাওলানা তাহের সাহেব কুদ্দিসা সিররুহুর কবর মসজিদের কাছে-ই বানানো হয়েছে এবং মারকাজ নেজামুদ্দিনে তিন বুজুর্গের কবব মসজিদঘেঁষা দেয়া হয়েছে! অথচ পাঁচ শত গজ অদূরে কবরস্থান বিদ্যমান। যেখানে মারকাজের সমস্ত বুজুর্গরা সমাধিত! গাঙ্গুহেও মসজিদের নিকেটে কবর বানানো হয়েছে এবং সুংড়ায় (উড়িষ্যা) মাওলানা ইসমাইল সাহেবের কবরও

(১) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে, পৃ. ৩-৪। আরো দেখুন: তুহফাতুল কারি, ৬/১৩৭।

মসজিদসংলগ্নে! অজানা আরো কত জায়গা আছে, যেখানে এমন দাফন-প্রথা চালু হয়েছে! এ সব কর্মকাণ্ড নিতান্ত ভুল। যত বড় লোক হন না কেন? তার কবর নিজের কবরস্থানে হবে, মসজিদের সাথে বা মসজিদসংলগ্ন স্থানে কবর বানানো অনুচিত।(১)

(১) ইলমি খুতবাত, ২/১৩০, আরো দেখুন: তুহফাতুল আলমায়ি, ২/১৩৬।

প্রথমদিকে জিয়ারত নিষিদ্ধতার কারণ

ইসলামে শুরুর দিকে সাধারণ মুসলমানদের অন্তরে একত্ববাদের বীজ পরিপূর্ণরূপে স্থায়িত্ব লাভ করেনি। কবরস্থানে গেলে কবর পূজার ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। এজন্য কবরে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল। অতঃপর যখন উম্মতের মেজাজে তওহিদ পাকাপোক্ত হয়ে যায়, ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা তাদের মন-মেজাজে জমে যায়, অন্তরে শিরিকের প্রতি ঘৃণা গেঁথে বসে এবং কবরস্থানে গমনে শিরিকের আশঙ্কা বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরস্থানে যাওয়ার অনুমোদন দিলেন। তিনি বৈধতার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন: এর বড় ফায়দা হচ্ছে, এর দ্বারা নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ হয় এবং তা কালের বিবর্তন থেকে শিক্ষাগ্রহণের উত্তম মাধ্যমও।(১)

যাদের কবর জিয়ারত করা যাবে

উপরিউক্ত হাদিসে জিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং এর কারণ বর্ণনা করতে বলা হয়েছে যে, তা মৃত্যুর ভয় সৃষ্টি করে। তাহলে এখন প্রশ্ন জাগে যে, স্রেফ নিজের কবরস্থানে যাওয়ার অনুমতি আছে, না ওয়ালি-বুজুর্গদের কবরও জিয়ারতের অনুমতি আছে? হ্যাঁ, ওয়ালিদের কবরও জিয়ারত করা যাবে। কিন্তু জিয়ারতের জন্য *শাদ্দুর রিহাল* তথা স্রেফ এ উদ্দেশ্যে-ই ভ্রমণ করা যাবে না।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আমার মতে বর্তমান যুগে কবর জিয়াতের উদ্দেশ্যে-ই ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ। কারণ এর মাধ্যমে দীন ধ্বংস হয় এবং বিদআতের প্রচলন হয়। কেননা মূর্খরা বলে থাকে যে, একবার খাজা মইনুদ্দিন চিশতি আজমিরি

---

(১) রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ, ৩/৬৯৪।

রাহিমাহুল্লাহুর মাজার জিয়ারত করা দুইবার হজের সওয়াবের সমতুল্য!(১)

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু লিখেন: ওয়ালিদের কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে ভ্রমন করা সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। এটা দীনের বিকৃতি এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের এবাদতের মাধ্যম।(২) তিনি আরো লিখেন যে, আজ মুসলমানদের কবরস্থানে গিয়ে দেখুন, খ্রীস্টানদের কবরস্থান এবং তাদের কবরস্থানের মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য বাকি থাকেনি! তা এই হাদিসের ওপর আমল না করার কুফল! আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে সমঝ দান করুন এবং হাদিসের ওপর আমল করার তওফিক দান করুন।(৩)

অনুমতি কাদের ব্যাপারে?

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু বলেন: যে হাদিসে জিয়ারতের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে, সে হাদিস দ্বারা বাপ-দাদা এবং আত্মীয়-স্বজনের কবর তথা নিজের গোরস্থান জিয়ারত করা-ই উদ্দেশ্য। পির-ওয়ালি বা অন্য শহরে অবস্থিত মাজার উদ্দেশ্য নয়। কখনো নয়। আল্লাহর শপথ করে বলছি, হাদিসটি পির-ওয়ালিদের মাজার জিয়ারতের ব্যাপারে নয়। নিজের বাপ-দাদা এবং স্বজনদের কবরের দৃশ্য দেখলে-ই তো দুনিয়ার ক্ষণ স্থায়িত্বের কথা এবং মৃত্যুর ভয় সৃষ্টি হয়। মানুষ তখন চিন্তাশীল হয় যে, এখানে-ই আমার বাবা, দাদা, মা এবং ভাইয়ের দেহ পড়ে আছে! তারা শুয়ে আছেন! আমাকেও তো একদিন এখানে আসতে হবে? তাহলে আমাকেও তো পরকালের সামানা প্রস্তুত করতে হবে। কিন্তু পির-ওয়ালিদের মাজার জিয়ারতে মৃত্যুর ভয় দূরের কথা, বিপরীত

---

(১) তাকরিরে তিরমিজি, পৃ. ১৫, শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি।

(২) বিস্তারিত দেখুন: তুহফাতুল কারি, ৪/৩৭।

(৩) তুহফাতুল আলমায়ি, ৩/৪৬৪।

নানা কু-প্রথা এবং গুনা ছাড়া অন্য কিছু-ই অর্জন হয় না, যা বলার প্রয়াস রাখি না।(১)

একটি ঘটনা

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু বলেন: হজরত মাওলানা আসআদ মাদানি কুদ্দিসা সিররুহু আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। আমাদের পরস্পর ছিল গভীর সম্পর্ক। তিনি বিভিন্ন জায়গায় সফর করতেন। একবার তিনি আমাকে আজমির নিয়ে যান। আমার মেজাজ সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। যাত্রাকালে তিনি আমাকে বললেন, সেখানকার অবস্থা দেখে আপনি কিছু-ই বলবেন না, নীরব থাকবেন! অতঃপর আমরা গেলাম, জিয়ারতের উদ্দেশ্যে কুরআনে কারিম থেকে কিছু তিলাওয়াত করলাম। আমি তো পাঁচ মিনিট তিলাওয়াত করে আর বরদাস্ত করতে পারিনি! আমরা সম্মুখে-ই মানুষ কবরে সাজদা করছে! কিন্তু মাওলানা তো নীরবতা-নিস্তব্ধতার সাথে তিলাওয়াত করছিলেন! আমি বললাম, মাওলানা! এজন্য-ই তো মনে হয় ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ যা বলার বলেছেন? একারণে-ই হয়ত তার মেজাজে কঠোরতা এসেছিল? জবাবে তিনি বললেন, তা এরচে আরো ভয়ঙ্কর ছিল।(২)

জিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু বলেন: আমাদের বড়রা দূর থেকে কবরে সালাম প্রদান করে দুআ এবং ইসালে সওয়াবের জন্য

---

(১) তুহফাতুল আলমায়ি, ৩/৪৬৬, দেওবন্দিয়াত কিয়া হে: বয়ান থেকে।

(১) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে: বয়ান থেকে।

তিলাওয়াত করে ফিরে আসতেন।(১) হাত উঠিয়ে দুআ করতে নেই। হ্যাঁ, প্রয়োজনবোধে কিবলামুখী হয়ে এবং কবরের দিকে পিঠ করে হাত উঠিয়ে দুআ করাতে কোন অসুবিধা নেই। তবুও বর্তমানে না উঠানো উত্তম।

হাফিজ কামালুদ্দিন মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহিদ ইবনুল হুমাম রাহিমাহুল্লাহ লিখেন: সুন্নাহ দ্বারা শুধু জিয়ারত করা প্রমাণিত এবং কবরের কাছে দাঁড়িয়ে দুআ করা। যেমনিভাবে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকিতে গিয়ে করতেন। তিনি সেখানে বলতেন, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! হে মুমিন সম্প্রদায়ের আবাস! আল্লাহ চাইলে তো নিশ্চয় আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব। আর তোমাদের জন্য এবং আমার জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।(২) ফাতাওয়া হিন্দিয়ায় বলা হয়েছে যে, কবর জিয়ারতের সুন্নাহসম্মত নিয়ম হল: জিয়ারত করা এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুআ করা। আর হাত উঠাতে হলে কিবলামুখী হয়ে উঠানো।(৩)

ইবরাহিম বিলয়াবির আমল

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু বলেন: ছাত্রকালে আমি দারুল উলুম দেওবন্দের সদরুল মুদাররিসিন আল্লামা ইবরাহিম বিলয়াবি রাহিমাহুল্লাহুর খাদেম ছিলাম। তিনি আমাকে কোন দিন বলতেন, সাইদ! চল হজরতুল উসতাজ শাইখুল হিন্দ রাহিমাহুল্লাহুর জিয়ারত করে আসি! আমি কয়েকবার তার সাথে কাসেমি কবরস্থানে গিয়েছিলাম। আমি দেখেছি যে, তিনি গেইটের প্রবেশপথে লাইটের

---

(১) তিলাওয়াত: জিয়ারতের জন্য আবশ্যক কিছু নয়।

(২) ফাতহুল কাদির লিল আজিজিল ফাকির, ২/১৫০, তাহকিক-তালিক: শাইখ আবদুর রাজ্জাক গালিব আলমাহদি, মাকতাবায়ে জাকারিয়া দেওবন্দ, রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ, ৩/৬৮৫, তুহফাতুল আলমায়ি, ৩/৪৬১।

(৩) ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ৫/৩৫০, ১/১৬৯, কিতাবুল ফাতাওয়া, ৩/২২৪, খালেদ সাইফুল্লাহ রহমানি।

পিলারের কাছে থেমে অনুমানিক দশ মিনিট পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুরআনে কারিম থেকে তিলাওয়াত করতেন। তারপর ফিরে আসতেন। আমার কাছে বিষয়টি আশ্চর্যজনক মনে হলে একদিন এর কারণ জিজ্ঞাসা করি যে, হজরত! গেইট থেকে সামনে অগ্রসর হন না কেন? বললেন, সাইদ! উসতাজজির কাছে যেতে আমার ভয় লাগে!

মূলত এটি ছিল লোক দেখানো কথা! যেমনিভাবে হাতির বাইরে প্রদর্শনের জন্য কিছু দাঁত রয়েছে এবং চিবানোর জন্য ভিতরে আরো কিছু দাঁত রয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে তিনি বাহ্যিক এমন কথা বললেও মূলত জিয়ারতের সুন্নাহ-সম্মত নিয়ম হল এটা-ই। অর্থাৎ কবরের দূরে থাকা, একেবারে নিকটে না যাওয়া।(১) কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এখন লোক রায়পুর এবং জানজানায় নতশির হয়, তারা মুরাকাবায় বসে। ভবিষ্যতে এই নতশির জমিন স্পর্শ করার আশঙ্কা রয়েছে, তখন সাজদা শুরু হয়ে যাবে! আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রক্ষা করুন।(২)

কবরের প্রতি সীমাহীন সম্মান-প্রদর্শন করা যাবে না

কবর যার-ই হোক না কেন? এর প্রতি সীমাহীন প্রদর্শন করা যাবে না। আবার কোন ধরনের অসম্মান প্রদর্শনেরও কোন সুযোগ নেই। শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব মুহাদ্দিসে দেহলভি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: কবরের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা এজন্য নিষিদ্ধ যে, এর দ্বারা অন্তর থেকে কবরের মহত্ব ও মর্যাদা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে লোক কবর জিয়ারতের জন্য যাতায়াত ছেড়ে দিতে পারে। অথচ কবর জিয়ারত করা শরিয়তকর্তৃক নির্দেশিত। এতে মৃত এবং জীবিত উভয়ের উপকার নিহিত।

সীমাহীন সম্মান প্রদর্শন করা এজন্য অবৈধ যে, তা মানুষকে শিরিক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। যখন মানুষ কবরের প্রতি সম্মানের ক্ষেত্রে

---

(১) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে, পৃ. ৩, তুহফাতুল আলমায়ি, ৩/৪৬২।

(২) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে, পৃ.৩।

বাড়াবাড়ি করে এবং অবৈধ পন্থায় সম্মান প্রদর্শন করে, তখন তা কবর পূজার মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। ফলে এর দ্বারা দীন বিকৃত হয়। ইহুদি-খ্রীস্টানরা নিজেদের ধর্ম এভাবে-ই পরিবর্তন করেছে! হাদিসে এসেছে যে, ইহুদি-খ্রীস্টানদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত অবতীর্ণ হোক! এজন্য যে, তারা নিজেদের নবিদের কবরকে মসজিদে রূপান্তর করেছে।(১)

মাসে একবার হলেও কবরস্থানে যাওয়া উচিত

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা কবর জিয়ারতকে অস্বীকার করিনি, আলোচনার উদ্দেশ্যও তা নয়। বরং এ কথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, কবর জিয়ারত হতে হবে শরিয়তের বাতলে দেয়া নিয়মানুসারে। হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু লিখেন: এখন লোকদের মধ্যে কবর জিয়ারতের ধারাবাহিকতা বিলুপ্ত প্রায়! বছরকে বছর অতিবাহিত হয়ে যায় নিজের কবরস্থানে কেউ যায়-ই না! এটা বেরলভিদের সাথে আমাদের মত-ভিন্নতার বিরূপ প্রতিক্রিয়া। মানুষ মনে করে যে, আমরা দেওবন্দিদেরকে কবরস্থানে বিলকুল না যাওয়া উচিত। এটা রুচিসম্মত কোন চিন্তাধারা নয়, বরং কবর জিয়ারত নির্দেশিত। এতে মৃতদের বিরাট উপকার নিহিত, জীবিতদেরও উপকার রয়েছে। নিজের মধ্যে মৃত্যুর কথা স্মরণ হয় এবং দুনিয়া-বিমুখতা পয়দা হয়। অতএব, মাঝে-মধ্যে সাধারণ কবরস্থানে যাওয়া উচিত। আর এ থেকে বেপরোয়া থাকা অনুচিত।

বর্তমানে বুজুর্গদের কবরে যাওয়ার চলমান প্রথা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা দেওবন্দিয়াত নয়, বরং তা বেরলভিয়াত। এই ধারাবাহিকতা বৃদ্ধি পেয়ে শীঘ্র কবর পূজার রূপ ধারণ করবে। ওয়ালি-আউলিয়াদের মাজার জিয়ারতে কোন কল্যাণও নেই। ওয়ালিদের কবরে গিয়ে কেউ নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণও করে না। এটা তো নিজের কবরস্থানে গেলে অর্জন হয়। অতএব, প্রতি মাসে নিতান্তপক্ষে

---

(১) মিশকাতুল মাসাবিহ: ৭১২, রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ, ৩/৬৮৫।

একবার হলেও এলাকার বা আশেপাশের কবরস্থান জিয়ারতে যাওয়া উচিত।(১)

(১) তুহফাতুল আলমায়ি, ৩/৪৬৬।

নবিদের কবর প্রসঙ্গ

আমবিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াসসালামের কবর সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা হল, কোন নবির কবর নির্দিষ্ট নেই। তবে আমাদের নবি সায়্যিদুনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সায়্যিদুনা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের কবর নির্দিষ্ট। ইবরাহিম আলাইহিস সালামের কবর ইতিহাসের বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা এবং আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর উম্মাহর অবিচ্ছেদ্য দর্শনের মাধ্যমে প্রমাণিত।

মেরাজ রজনীতে মুসা আলাইহিস সালামের কবরের ব্যাপারে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলেছেন: আমি বালুর লাল টিলার কাছে মুসাকে নিজের কবরে নামাজরত দেখেছি। কিন্তু তা কোথায় অবস্থিত? নির্ধারণ করেননি।(১) নবিদের কবর গোপনীয় থাকার রহস্য কী? এ ব্যাপারে কিতাবুল্লাহ বা সহিহ হাদিসে কোন কিছু-ই বর্ণিত নেই। এ দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, আমবিয়া আলাইহিমুস সালামের কবর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগে-ই কালের দীর্ঘতায় দৃশ্যহীন হয়ে গেছে। নির্দিষ্ট করে দৃঢ়তার সাথে বলা যাবে না যে, এটা অমুক নবির কবর।

সাধারণত বিভিন্ন কবরের ব্যাপারে যেসব হাদিস বর্ণনা করা হয়, সবই মিথ্যা ও বানোয়াট। শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন: কোন নবির কবর নির্দিষ্ট নেই, যার ব্যাপারে মতৈক্যের সাথে বলা যাবে যে, এটা অমুক নবির কবর। তবে আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর এ থেকে ভিন্ন।

---

(১) সহিহ বুখারি: ১৩৩৯ সুনানে নাসাই: ১৬৩১।

কেউ কেউ ইবরাহিম আলাইহিস সালামের কবরের কথাও বলেছেন।(১)

এ কথাও জেনে রাখা ভালো যে, হজরত দানিয়াল আলাইহিস সালামের– যদি তাকে নবি মানা হয়– কবর তাসতুর নামক জায়গায় প্রকাশিত হলে হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একে গায়েব করে দেন। কারণ মানুষ সেখানে ইসতিসকা করত। পরে সেখানকার গভর্ণর আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে এ বিষয়ে সংবাদ দিলে তিনি শিরিকের দরজা বন্ধ করার লক্ষ্যে চিঠি লিখলেন যে, দিনের বেলায় কোন জায়গায় তেরোটি কবর খনন করে রাতের আধাঁরে কোন একটি কবরে লাশ দাফন করে দাও, যাতে মানুষ ফিতনায় লিপ্ত না হয়।

কিন্তু আমাদের রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর প্রকাশিত। কমবেশি সোয়া লক্ষ সাহাবি ছিলেন। তাই রওজা মুবারক গোপন হওয়ার কোন কারণ ছিল না, তার কবর প্রকাশিত থাকবে। এজন্য মৃত্যুর সময় মুসলমানদেরকে সতর্কবাণী শুনিয়েছেন যে, এমনভাবে যেন তার কবর বানানো না হয় যে, এতে মানুষ সমবেত হবে। আর যেন অন্যান্য কবর থেকে উচুঁ না করা হয়।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তোমরা নিজেদের ঘরকে কবর বানিও না। আর আমার কবরকে ইদে রূপান্তর কর না। বরং তোমরা আমার ওপর দরুদ পাঠ কর। কেননা তোমরা যেখানে-ই থাক না কেন, তোমাদের দরুদ আমার কাছে পেশ করা হয়।(২) এমনিভাবে হজরত

---

(১) আলফাতাওয়াল কুবরা, ৪/৪৪৯, ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়িমাতি লিল বুহুসিল ইলমিয়াতি ওয়াল ইফতা, ১/২৫৯।

(১) সুনানে আবু দাউদ: ২০৪২, মুসনাদে আহমাদ, ১৪/৪০৩, মুআসসিসাতুর রিসালা। শাইখ শুআইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহ বলেন: এর সনদে আবদুল্লাহ বিন নাফে হওয়ার কারণে তা হাসান পর্যায়ের।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত আছে যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর অসুস্থতায় বলেছিলেনঃ আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক ইহুদি-খ্রীস্টানদের ওপর, যারা নিজেদের নবিদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে।(১)

এছাড়াও তাদের কবর গোপন থাকার পিছনে অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে কোন না কোন হেকমত রয়েছে। এরকমও তো হতে পারে যে, মানুষ যদি নিজেদের নবিদের কবর সম্পর্কে অবগত হয়ে যায়, তাহলে একে উপাসনালয়ে রূপান্তর করে ফেলবে। ফলে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের পূজা শুরু হয়ে যাবে! বিশেষত ঐ সমস্ত সম্প্রদায়, যারা পথচ্যুত হয়ে গেছে। যেমনঃ ইহুদি-খ্রীস্টান। সর্বাবস্থায় মুসলিম উম্মাহ স্রেফ তাদের নবিদের কবর জিয়ারত করে থাকে, যে কোন ধরনের বাড়াবাড়ি এবং ছাড়াছাড়ি ব্যতিরেকে।

পানজাবে নবিদের মাজার রয়েছে?

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু বলেনঃ লোকমুখে প্রসিদ্ধ যে, হিন্দুস্তানের পানজাবস্থ সারহিন্দের ব্রাসে নবিদের মাজার রয়েছে! মানুষ নিয়মিত সেখানে জিয়ারতও করে থাকে। কিন্তু তা উম্মাহর আকিদা-বিরোধী হওয়ায় বিশ্বাস করা যাবে না। এই কবরগুলো বিশুদ্ধ কোন মাধ্যম বা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়। একদিন ঘটনাক্রমে মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহিমাহুল্লাহ সেখানে সালাত আদায় করেন। তখন তিনি কাশফের মাধ্যমে সেখানে নবিদের কবর রয়েছে বলে অবগত হন। অতঃপর তিনি আলগা আলগা কবরগুলো মিলিত করে নয়টি কবরের রূপ দেন।

কিন্তু কথা হল, কাশফ তো শরয়ি কোন দলিল নয়, তা সর্বদা-ই সন্দেহপূর্ণ বিষয়। দলিল হচ্ছে, কুরআন-হাদিস। মানুষকে তা-ই মানতে বাধ্য করা হয়েছে। কাশফ না নিজের জন্য অকাট্য দলিল এবং

(১) সহিহ বুখারিঃ ১৩৩০, সহিহ মুসলিমঃ ৫২৯।

না অন্যের বিরুদ্ধে। এর দ্বারা অকাট্যভাবে শরিয়তের কোন হুকুমও প্রমাণিত হয় না। কাশফ-মুকাশাফা বেলায়েতেরও দলিল নয়। সুন্নাহর অনুসরণ-ই বেলায়েতের একমাত্র দলিল।

মোটকথা, কাশফের দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে কোন কিছুর প্রামাণিকতা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, হিন্দুস্তান বা অন্য কোথাও নবিদের মাজার থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে নিশ্চিতভাবে এর সন্ধান পাওয়া গেছে বলে ইতিহাসের কোন বর্ণনা বা কোন হাদিসে পাওয়া যায় না। হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু আরো বলেন: এগুলো তো বানোয়াট কবর।(১)

আসারুন নবি থেকে বরকত গ্রহণ করা যাবে

আসারুন নবি তথা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্তু যেমন: জুতা, রুমাল, তরবারি ইত্যাদি, যা তুরস্কসহ মুসলিম-বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় সংরক্ষিত রয়েছে বলে লোকমুখে প্রসিদ্ধ। এ ব্যাপারে আমাদের উলামায়ে দেওবন্দের আকিদা কী? হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু বলেন: এ বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস হল: لا نكذبها ولا نصدقها: না দৃঢ়তার সাথে এ সব বস্তুকে বিশ্বাস করব এবং না একে অস্বীকার করব। অস্বীকার করা ঠিকও নয়। এ ব্যাপারে চুপ থাকা-ই নিরাপদ। তবে আমবিয়া বা বুজুর্গদের স্মৃতি থেকে বরকত হাসিল করা নিঃসন্দেহে কুরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি করা ঠিক নয়।[২]

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া স্মৃতিপট থেকে বরকত গ্রহণ করা নিঃসন্দেহ বৈধ আছে। আর তা শুধু সাহাবা, তাবেয়ি এবং তবে তাবেয়িদের সাথে নির্দিষ্ট ছিল না। কেননা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া বস্তু দ্বারা বরকত হাসিল

---

(১) দরসে বুখারি এবং ইলমি মজলিস থেকে।

(২) দরসে বুখারি এবং ইলমি মজলিস থেকে।

করা এখনো চলমান। বন্ধ হয়ে যাওয়ার গ্রহণীয় কোন কারণ নেই। হজরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন: রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মিনাস্থ জামরায় এসে পাথর নিক্ষেপ করেন। পরে মিনায় অবস্থিত বিশ্রামস্থলে এসে কুরবানি দেন। তারপর ক্ষৌরকারকে চুল মুণ্ডাতে বললেন, আগে ডানদিকে, পরে বামদিকে মুণ্ডাতে ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর তিনি চুলগুলো মানুষের মধ্যে বণ্টন করে দিতে লাগলেন।[১] ইমাম নববি (মৃত্যু: ৭৭৬ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ বলেন: এই হাদিস থেকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল দ্বারা বরকত হাসিল করা এবং বরকতের জন্য তা সংরক্ষণ করা বৈধ প্রমাণিত হয়।[২]

মৌলিক কিছু কথা

১- সহিহ বুখারির রেওয়ায়েতে এসেছে যে, আমর বিন হারেস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন: রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকালের সময় কোন দিরহাম-দিনার ছেড়ে যাননি। না তিনি রেখে গেছেন কোন দাস-দাসী বা না অন্য কোন বস্তু। সাদা রঙের গাধা, কিছু অস্ত্র এবং সদকার জমি ব্যতীত।[৩] এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি স্বল্প কিছু বস্তু রেখে গেছেন।

২- সাহাবায়ে কেরামের যুগের পর এমন অনেক তথ্য বর্ণিত হয়েছে, যদ্দারা খুলাফা, উলামা এবং বুজুর্গরা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া বস্তু থেকে বরকত হাসিল করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। যদিও এর অনেক তথ্য সঠিক নয়। দুর্বলতার কারণে হোক অথবা তার দিকে সম্বন্ধ সঠিক না হওয়ার কারণে হোক।

---

(১) সহিহ মুসলিম: ১৩০৫।

(২) আলমিনহাজ শরহে সহিহ মুসলিম, পৃ. ১/৪২১।

(৩) সহিহ বুখারি: ২৭৩৯।

খেলাফতে উসমানিয়ার রাজধানী ইসতানবুলে থাকা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া বস্তু সম্পর্কে গবেষক আহমাদ তাইমুর বাশা রাহিমাহুল্লাহ দীর্ঘ আলোচনা করে বলেন: এ কথা লুক্কায়িত নয় যে, এ সবের কিছু সত্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এতদসত্ত্বেও তা প্রমাণ-অপ্রমাণ করতে আমরা কোন নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামকে দেখিনি। এ বিষয়ে আল্লাহ-ই ভালো জানেন। অবশ্য দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ায় কিছু বস্তুতে সন্দেহ থেকে-ই যায়। বিশেষত যেসব বস্তু হজরত নুহ, খলিল, দাউদ, শুআইব এবং ইউসুফ আলাইহিমুস সালামের দিকে নিসবত করা হয়।(১)

৩- যুদ্ধ বা ফিতনা ইত্যাদির কারণে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক স্মৃতি হারিয়ে গেছে বলে প্রমাণিত। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বর্ণনা যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মোহর বানিয়েছিলেন, যা ছিল তার হাতে। অতঃপর ক্রমান্বয়ে তা ছিল আবু বকর, উমর, উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমের হাতে। শেষ পর্যন্ত তা হজরতের হাত থেকে *আরিস* নামক কুপে পতিত হয়ে যায়। আর এতে ছিল *মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ* অঙ্কিত।(২)

৪- তার চাদর এবং কাটা ডাল: আব্বাসি খেলাফতের শেষ দিকে যখন ৬৫৬ হিজরিতে তাতারিরা বাগদাদে আক্রমণ করে, তখন তারা তা হস্তগত করে ফেলে।

৫- এক জোড়া জুতা তার দিকে সম্বন্ধ করা হত, তা ৮০৩ হিজরিতে তাইমুর লঙ্গের ফিতনার সময় হারিয়ে যায়।

---

(১) আলআসারুন নাবাবিয়া, পৃ. ৭৯, আহমাদ তাইমুর বাশা, দারুল কিতাবিল আরবি মিশর।

(২) সহিহ বুখারি: ৫৮৭৩, সহিহ মুসলিম: ২০৯১।

৬- হারিয়ে যাওয়ার আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে, যার কাছে তা থাকত, সে একে তার কাফনের সাথে দিতে মৃত্যুর সময় ওসিয়ত করত। যেমন: হজরত সাহল ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু করেছিলেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, এ সব বস্তু সন্দেহাতীত সূত্রে প্রমাণিত নয়। এজন্য শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আমরা বিশ্বাস করি যে, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতিচিহ্ন, যেমন: কাপড়, চুল এবং অন্যান্য বস্তু নিশ্চয় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। দৃঢ়তার সাথে তা প্রমাণ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।[১]

কারি মুহাম্মাদ তায়্যিব রাহিমাহুল্লাহ বলেন: উলামায়ে দেওবন্দ পবিত্র স্থান এবং বুজুর্গদের স্মৃতিচিহ্নের বরকত এবং এ থেকে বরকত গ্রহণের প্রবক্তা। কিন্তু একে সাজদার স্থান বানানোর প্রবক্তা নন। যদি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া বস্তু যেমন: ভ্রু মোবারক, মোজা মোবারক অথবা জুতা মোবারকের একটি ফিতাও নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া যায়, তাহলে তারা একে বাদশাদের মুকুট এবং দুনিয়ার সমস্ত বস্তু থেকে বহু গুণে বড় দৌলত মনে করেন। আবার তা সূত্রহীন হলে বে-আদবি থেকে বেঁচে এ থেকে এড়িয়ে চলাকে আবশ্যক মনে করেন। এমনিভাবে তারা ওয়ালিদের তাবাররুকাত এবং স্মৃতিচিহ্নের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকেও কল্যাণকর ও বরকতময় মনে করেন। কিন্তু একে রুকু ও সাজদার স্থান বানানো বা তাদের জন্য বিশেষ বন্দেগি বা রসমবন্দির প্রবক্তা নয়। ([২])

---

(১) আততাওয়াসসুল, ১৪৭, তাকদিসুল আশখাস ফিল ফিকরিস সুফি, ২/১৭২।

([২]) উলামায়ে দেওবন্দা কা দীনি রুখ আওর উনকা মাসলাকি মিজাজ, পৃ. ১৩১, কারির মুহাম্মাদ তায়্যিব।

মোটকথা, আমরা নবিদের রেখে যাওয়া বস্তুকে একেবারে অস্বীকার করি না। আবার দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাসও করি না। যতক্ষণ না এর বিশুদ্ধ কোন সূত্র থাকবে। এটাই নিরাপদ।

(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

পির-মুরিদি

হজরতু উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু বলেন: পির-মুরিদি নিয়ে উম্মত তিন ভাগে বিভক্ত:

১- **গায়রে মুকাল্লিদ:** গায়রে মুকাল্লিদ এবং মওদুদি সাহেবের মতে ইসলামে আত্মশুদ্ধির বাইআতের কোন ভিত্তি নেই! মওদুদি সাহেব তো একে চুনিয়া বেগম। অর্থাৎ আফিম আখ্যা দিয়েছেন। গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরাও বলে থাকেন যে, যেভাবে চোরকে ধরা ফরজ, পিরকে ধরাও ফরজ! অর্থাৎ চোরকে ধরে যেমন উত্তম-মাধ্যম দেয়া ফরজ, পিরকেও ধরে গণধোলাই দেয়াও ফরজ! তারা আরো বলে যে, পির বলতে-ই ভণ্ড, হক্কানি পির কিছু-ই নেই! এটি তাদের চরম সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি।

২- **বেরলভি:** বেরলভি ভাইয়েরা পির ধরাকে ফরজ মনে করে থাকেন! এমনকি তাদের প্রসিদ্ধ উক্তি হচ্ছে, পরকালে *গুঙ্গা পির* তথা কুরআন কোন কাজে আসবে না, *বুলতা পির* কাজে আসবে! নাউজুবিল্লাহ!

৩- **দেওবন্দি:** আমাদের দৃষ্টিতে তাসাউফের বাইআত কুরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তবে তা পরকালে মুক্তির জন্য জরুরি কিছু নয়। জান্নাতে মর্যাদা বুলন্দির জন্য তা নিসক মুসতাহাব, আবশ্যক কিছু নয়। নিজে নিজে আত্মশুদ্ধি করে নিলে-ই যথেষ্ট।(১)

আত্মশুদ্ধির বাইআত কেন?

(১) বিস্তারিত পড়ুন: তুহফাতুল কারি, ১/২২১-২২৪, তাফসিরে হেদায়েতুল কুরআন, ৮/ ২৫৫, মুফতি সাইদ আহমদ পালনপুরি, মাকতাবায়ে হিজাজ দেওবন্দ।

প্রশ্ন জাগে যে, আত্মশুদ্ধির বাইআত কেন করব? হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু লিখেন: এই বাইআতের ফায়দা হল, এর দ্বারা প্রচুর পরিমাণ নফল আমল করে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা হাসিল করা যায়। এটা-ই বাইআতের একমাত্র লক্ষ্য। পরকালে নাজাতের জন্য তো সহিহ ইমান এবং নেক আমল-ই যথেষ্ট। আর যারা বলেন যে, পির ছাড়া নাজাত অসম্ভব, তাদের কথা সঠিক নয়।

বাইআতের উপকারিতা

১- প্রচুর পরিমাণ নফল আমল করে জান্নাতে উঁচু মর্যাদা অর্জন হয়। মানুষ নিজে নিজেও তা করতে সক্ষম। তবে সাধারণত বাইআত ছাড়া সফল হওয়া যায় না।

২- এর দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়। যেভাবে আমাদের শরীরে ময়লা লাগলে পরিষ্কার করে থাকি, ঠিক তেমনি ভিতরেও ময়লা হয়। আর একে বাইআতের মাধ্যমে পরিষ্কার করা উচিত।(১)

পির-মুরিদি: বাড়াবাড়ি এবং শিথিলতা

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু বলেন: জেনে রাখা উচিত যে, আমাদের দেওবন্দি তাসাউফে কুরআন-হাদিসের বিরোধী কিছু-ই নেই। এর কোন অবকাশও নেই। এ কথা বুঝার জন্য আমাদেরকে আগে নির্ধারণ করতে হবে যে, আমাদের তাসাউফ কার তাসাউফ? কোত্থেকে এর সিলসিলা শুরু হয়েছে? কাসেম নানুতুভি এবং রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রাহিমাহুমুল্লাহদ্বয় থেকে, না অন্যদের থেকে? যদি কাসেম নানুতাভি এবং রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহির তাসাউফ-ই আমাদের তাসাউফ হয়ে থাকে, তাহলে তো আমাদের তাসাউফে কোন ধরনের অভিযোগ উত্থাপিত হবে না। কেউ অভিযোগের আঙ্গুল উঠাতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ। আর যদি বলি যে, আমাদের তাসাউফ অমুক-তমুকের তাসাউফ! তাহলে আমাদের ওপর হাজারো অভিযোগ উত্থাপিত হবে-

---

(১) তুহফাতুল কারি, ১/২২১, তাফসিরে হেদায়েতুল কুরআন, ৮/২৫৫।

ই। বিরোধিরা উত্তাপন করবে-ই! অভিযোগের তীর নিক্ষেপ করা যথাযথও বটে। কেননা আমাদের কিতাবাদিতে আজগুবি অনেক কিছু লেখা আছে! এ নিয়ে বিরোধিরা অভিযোগ করলে জবাব আমাদেরকে-ই দিতে হবে! খেসারত আমাদেরকে-ই ভোগ করতে হবে!(১)

আমাদের তাসাউফের উৎস?

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু আরো বলেন: আর যদি বলি যে, আমাদের তাসাউফ হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতাভি এবং মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রাহিমাহুমাল্লাহদ্বয়ের তাসাউফ, তাহলে আমাদের ওপর কোন অভিযোগ উত্থাপিত হবে না। কারণ তাদের তাসাউফে কুরআন-সুন্নাহর খেলাপ কিছু-ই নেই। আর এটা-ই হচ্ছে, দেওবন্দি তাসাউফ।

কুরুনে উলা তথা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন এবং তবে তাবেইনের স্বর্ণযুগের পর থেকে উলামায়ে দেওবন্দের যুগ অবধি তাসাউফে কুরআন-সুন্নাহর খেলাপ হাজারো বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। উলামায়ে দেওবন্দ এসে একে সংস্কার করে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবিক বিষয়গুলো গ্রহণ করেছেন এবং বিপরীত সমস্ত বিষয় বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। মোটকথা, কুরআন-সুন্নাহ যে তাসাউফের অনুমতি প্রদান করে, আমাদের তাসাউফ ততটুকু-ই। (২)

বাইআতের উদ্দেশ্য

কোন বুজুর্গের হাতে বাইআত হব কেন? খিলাফত লাভের জন্য, না অত্মশুদ্ধির জন্য? মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: বাইআত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, একনিষ্ঠতা অর্জন করা এবং তা

---

(১) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে: বয়ান থেকে।

(২) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে: বয়ান থেকে।

(২) ফাতাওয়া রশিদিয়া, পৃ. ১৯৭, তালিফাতে রশিদিয়ার সাথে মুদ্রিত।

ইসলামের জ্যোতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আর তা পির ধরা ছাড়াও অর্জন হতে পারে। যদিও অধিকাংশ সময় কারো মাধ্যমের প্রয়োজন হয়।(১)

শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ইহসান নতুন কোন বস্তু নয়, অন্তরের পরিষ্কার-পরিছন্নতা উপার্জনের নাম-ই হল ইহসান। এটা-ই তাসাউফের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাসাউফের উদ্দেশ্য নতুন কিছু নয়। হাদিসে জিবরিলে যে সব কথা উল্লেখ আছে, এর উপর-ই তাসাউফের ভিত্তি। কিন্তু কালের দূরত্বে অন্তরে ময়লা-আবর্জনা বেশি হয়ে যায়। ফলে ঘষা-মাজারও প্রয়োজন বেশি হয়ে দাঁড়ায়।(২) শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানি রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেন: প্রত্যেক দলে যেমন ভেজাল থাকে, ঠিক এই জামাআতের মধ্যেও এমন কিছু লোকের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যাদের কারণে কিছু গুমরাহি সৃষ্টি হয়ে গেছে। 'দীনকে ঢাল বানিয়ে দুনিয়া উপার্জন করার' মতো মানুষ প্রত্যেক জামাআতের মধ্যে-ই যুগ যুগ ধরে ছিল। দুই-একজনের দোষের কারণে পুরা দীন মন্দ হয়ে যায় না। হ্যাঁ, বাইআতের সময় চিন্তা-ফিকির করে সঠিক এবং নির্ভেজাল মুর্শিদ নির্বাচন করা উচিত।(৩)

শরিয়ত এবং তরিকত অভিন্ন বস্তু

তিনি আরো বলেন: আমার ভাইয়েরা! বাইআত এবং তরিকত বিদআত নয়। তরিকত আবার শরিয়ত থেকে পৃথকও নয়। বরং তা হচ্ছে শরিয়তের খাদেম এবং এর পূর্ণঙ্গতা দানকারী। বড়রা শাইখ আবদুল কাদির জিলানি, হজরত খাজা বাহা উদ্দিন, হজরত খাজা

---

(১) বিস্তারিত দেখুন: খুতবাতে মাদানি, ৬৩, হুসাইন আহমাদ মাদানি, জমজম বুক ডিপো দেওবন্দ।

(৩) বিস্তারিত দেখুন: খুতবাতে মাদানি, পৃ. ৬৯, হুসাইন আহমাদ মাদানি, জমজম বুক ডিপো দেওবন্দ।

মইনুদ্দিন চিশতি এবং হজরত শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দি রাহিমাহুমুল্লাহসহ সমস্ত বুজুর্গদের এ সব তরিকা প্রচলন করেছেন। যদ্দারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি অর্জন হয়। এতে শরিয়তের খেলাপ কিঞ্চিত পরিমাণও কিছু নেই। এর উদ্দেশ্য স্রেফ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা এবং পরকালে নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা।(১)

জুহদ ও ইহসানের প্রামাণিকতা

আবার অনেক ভাইয়েরা পির-মুরিদিকে বিলকুল অস্বীকার করে বসেন। তাদের এমন কর্ম-পদ্ধতি সঠিক নয়। পির-মুরিদি অন্য শব্দে জুহদ ও ইহসান অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই, তা কুরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। উসতাজে মুহতারাম দামাত বারাকাতুহুম লিখেন: তাসাউফের জন্য হাদিসে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইহসান এবং জুহদ। প্রথম শব্দটি শুধু হাদিসে জিবরিলে এসেছে এবং দ্বিতীয় শব্দ অন্যান্য হাদিসে এসেছে। *আলমুজামুল মুফাহরাসু লিআলফাজিল হাদিসিশ শরিফ* এ (زَهَدَ، زَهِّدَ، زُهْدٌ و زَهَادَةٌ) এর সূত্রে নজর করলে অনেক হাদিস পাওয়া যাবে।(২)

প্রথম শব্দটি ব্যাপকহারে প্রচলিত হয়নি। সাধারণত ইসলামি ওয়াজ-মাহফিলে দ্বিতীয় শব্দ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। হাদিসের বুনিয়াদি কিতাবেও *আবওয়াবুজ জুহদ*'র শিরোনাম রয়েছে। সুনানে তিরমিজিতে রয়েছে: (أبواب الزهد عن رسول صلى الله عليه وسلم) এবং الزهد والرقاق শিরোনামে পৃথক বইও লেখা হয়েছে। আবদুল্লাহ বিন মোবারক

---

(১) খুতবাতে মাদানি, পৃ. ৬৮।

(২) আলমুজামুল মুফাহরাসু লিআলফাজিল হাদিসিশ শরিফে এ বিষয়ে মোট ১৯টি হাদিস রয়েছে। দেখুন: খণ্ড ২, পৃ. ৩৪৯, ১৯৪৩ সালের প্রকাশন।

(মৃত্যু: ১৮১হিজরি) রাহিমাহুল্লাহুর *কিতাবুজ জুহদি ওয়াররিকাক* মুদ্রিত।(১)

زُهْد অর্থ হল, দুনিয়া-বিমুখতা। জাহেদরা যেহেতু দুনিয়ার জঞ্জালমুক্ত হয়ে পশমের কাপড় পরিধান করতেন, এজন্য তাদেরকে সুফি বলা হত। জুহদ ও দুনিয়া-বিরাগের মূল বিষয়টি-ই পরে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। চাই কেউ পশমের পোশাক পরিধান করুক অথবা না করুক। এর পর তাসাউফ শব্দ বহুলপ্রচলিত হয়ে যায়। এখন এ শব্দ-ই মানুষের মুখে মুখে।

সারকথা: ইহসান, জুহদ এবং তাসাউফ এক ও অভিন্ন শব্দ। তা ভিত্তিহীন নয়, বরং দলিল দ্বারা প্রমাণিত। যারা একে অস্বীকার করেন, তারা ভুলের মধ্যে আছেন।

অতঃপর যখন তাসাউফে অনারবি রীতিনীতি মিশ্রিত হয়ে এবাদতে শরিয়ত-বিরুদ্ধ নীতি-কর্মের প্রচলন ঘটে। তখন ইবনে তাইমিয়া এবং ইবনুল কায়্যিমসহ বড়রা এই অনারবি তাসাউফের কঠিন সমালোচনা করেছেন। তারা মূল তাসাউফের বিরোধী নন, তারা পরিবর্ধিত আকৃতি-প্রকৃতি অস্বীকার করেছেন মাত্র।

জনাব মাওলানা আবদুল হাফিজ মক্কি রাহিমাহুল্লাহ ইবনে তাইমিয়াসহ সালাফি মতাদর্শের ইমামগণ এবং বড় বড় উলামায়ে কেরামগণের রচনাবলী থেকে তাসাউফ-সংক্রান্ত বক্তব্যগুলো পৃথক করে একটি বই বিন্যস্ত করেছেন। এর নাম দিয়েছেন *মাওকিফু আয়িম্মাতিল*

---

(১) বইটি মুহাদ্দিসে কাবির, আবুল মাআসির, মাওলানা হাবিবুর রাহমান আজমি রাহিমাহুল্লাহুর তাহকিকের সাথে দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও ইমাম আবু দাউদ সাজিস্থানি (মৃত্যু ২৭৫ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহকৃত 'আজজুহদ' বইটি প্রকাশিত। খতিব বাগদাদি (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরি) কৃত 'আজজুহদু ওয়াররিকাক', ইমাম আবু হাতেম রাজি (মৃত্যু ২৭৭ হিজরি) কৃত 'আজজুহদ'সহ এ বিষয়ে অনেক কিতাব প্রকাশিত।

হারাকাতিস সালাফিয়াতি মিনাত তাসাউফি ওয়াসসুফিয়া। বইটি প্রকাশিত।

এমনিভাবে তার ছাত্র ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ *মাদারিজুস সালিকিন* নামে শাইখুল ইসলাম আবু ইসমাইল আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আলহারাভি (মৃত্যু: ৪৮১ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহকৃত *মানাজিলুস সায়িরিন ইলা রাব্বিল আলামিনের* ব্যাখ্যা করেছেন, যা চার খণ্ডে মুদ্রিত।(১)

উলামায়ে দেওবন্দরা তাসাউফ থেকে অনারবি ধ্যান-ধারণা এবং শরিয়ত-বহির্ভূত বস্তুগুলো যথাসম্ভব বের করে দিয়েছেন। তারা একে সংস্কার করে শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত করে আমল করে থাকেন।(২)

ইসলামি পরিভাষার সংরক্ষণ করা জরুরি

পির-মুরিদির শরয়ি পরিভাষা হচ্ছে, ইহসান বা সুলুক। ইহসান বা সুলুক সবাই স্বীকার করে থাকেন। কিন্তু সমস্যা তাসাউফ পরিভাষা নিয়ে। তাই আমাদের জন্য উত্তম হল যে, যবানে-কলমে ইসলামি পরিভাষা ব্যবহার করা। এমনটা করলে অস্বীকারের তা কোন সুযোগ বাকি থাকবে না। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: কুরআন-হাদিসে যে বস্তুর নাম যেভাবে এসেছে, তা পূর্বের নাম বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এমন নামে নামকরণ করা অপছন্দনীয়। এজন্য অপছন্দনীয় যে, এমন কর্ম দীনকে মানুষের কাছে দোদুল্যমান করে তুলবে এবং তাদের কাছে নিজেদের কিতাব অস্পষ্ট করে দিবে।(৩)

---

(১) মূল বই এক খণ্ডে দারুল কুতুবিল ইলমিয়া থেকে এবং ব্যাখ্যাগ্রন্থ দারুল কিতাবিল আরাবি বৈরুত থেকে প্রকাশিত। মুহাম্মাদ মুতাসিম বিল্লাহ বাগদাদির তাহকিক-তালিকের সাথে।

(২) রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ, ১/১৩৫, সুলুক ও ইহসান সম্পর্কে জানতে আরো পড়ুন: রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ, ৪/২৬১, ৪/৩৭১।

(৩) রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ, ৩/৩২১।

বেরলভিদের সাথে আমাদের পার্থক্য কোথায়?

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু বলেন: দেওবন্দিয়াত এবং বেরলভিয়াতের মধ্যে পার্থক্যকারী দ্বিতীয় বিষয় হল, তাসাউফ বা পির-মুরিদি। তারা পির-মুরিদিকে ফরজ মনে করে থাকেন! এটা তো তাদের বিনা পূজির ব্যবসা! তারা পির ধরাকে-ই মুক্তির একমাত্র মাধ্যম মনে করেন। কিন্তু দেওবন্দিরা একে স্রেফ মুসতাহাব মনে করেন। কিন্তু আজ অত্যন্ত বেদনার্ত ভাষায় বলতে হচ্ছে যে, বর্তমানে তাসাউফের ক্ষেত্রে আমরা মূল দেওবন্দিয়াতে নেই! আজ তো পির-মুরিদি দোকানদারিতে পরিণত হয়েছে!(১)

ফ্রি খাওয়ানো!

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু আরো বলেন: তাজ্জবের ব্যাপার হল যে, বর্তমানে খলিফা এবং মুরিদসংখ্যা বৃদ্ধির ধান্ধায় আমাদের ঘরানার পির সাহেবগণ দেশ-বিদেশ থেকে কালেকশন করে মুরিদদেরকে ফ্রি খাওয়ানোর সু-ব্যবস্থা করে থাকেন! অথচ আমাদের আকাবিরগণ মুরিদদেরকে কখনো ফ্রি খাওয়াননি। নিজের আত্মশুদ্ধি করবে আর পির খাওয়াবেন এটা কেমন কথা? বুঝে আসে না।

হাকিমুল উম্মত হজরত আশরাফ আলি থানভি রাহিমাহুল্লাহুর খানকায় পুরা বছর মুরিদদের সমাগম থাকত। কিন্তু তার তরফে কোন খাবারের আয়োজন থাকত না। নিজেরা-ই নিজেদের খানা-পিনার ব্যবস্থা করত। নিজেদের খেয়ে হাজারো লোক আত্মশুদ্ধির জন্য তার কাছে আসত।(২)

খেলাফত নিয়ে চলছে ব্যবসা!

(১) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে: বয়ান।

(২) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে: বয়ান।

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু বলেন: এমনিভাবে বর্তমানে খেলাফত নিয়েও বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যাচ্ছে! এখন তো খলিফার অর্থ হল এজেন্ট! ভালো মানের এজেন্ট দেখে এখন খেলাফত দেয়া হয়! বর্তমানে চতুর্দিকে একই স্লোগান শোনা যায় যে, অমুক অমুক পিরের খলিফা! কারো নাম উচ্চারণ করতে শুরুতে সব কিছু ব্যতিরেকে হলেও তিনি কার খলিফা? তা না বললে না হয়! ([১])

অনেক লোক আমার সাথে মোলাকাতের জন্য আসেন, সাথে গাইড হিসেবে কাউকে নিয়েও আসেন! পরিচয় জানতে চাইলে সাথে আসা লোকটি বলে দিবে, হজরত তো অমুকের খলিফা! কোন মাদরাসার পড়ুয়া এবং করেন কী? এ সবের পরিচয় না দিয়ে শুধু বলবে, অমুকের খলিফা! এমনটা কথার অর্থ কী!(২) বর্তমানে তো খেলাফত অর্জনের সহজ পদ্ধতি হচ্ছে, মিথ্যা স্বপ্ন বানিয়ে পির সাহেবের কাছে বর্ণনা করা। এমন হাজারো ঘটনা জ্ঞানে আছে। আর খেলাফত লাভের পর এটাকে কেন্দ্র করে চলে ধান্ধামি!

নানুতাভি ও গাঙ্গুহির খুলাফা

আজকের যুগে বাইআতের উদ্দেশ্য-ই হয়ে গেছে যেন খেলাফত লাভ করা! হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু বলেন: আমাদের আকাবির যাদের থেকে আমাদের তাসাউফের সূচনা হয়েছে, আমাদের মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতাভি রাহিমাহুল্লাহ শুধু আলেমদেরকে বাইআত করতেন। তবে তিনি কাউকে খেলাফত প্রদান করেননি। আর মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রাহিমাহুল্লাহও কয়েকজনকে খেলাফত প্রদান করেছেন। কিন্তু বর্তমানে আমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে চলছে!(৩)

---

(১) তিনি কত তরিকার খলিফা এবং কোন এরিয়ার বিখ্যাত পির এও বলতে ভুল করা হয় না!

(২) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে: বয়ান।

(৩) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে: বয়ান।

বাড়াবাড়ির কবলে পির-মুরিদি

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে অনেক প্রকারের বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। এখানে যে বাইআতের আলোচনা হচ্ছে, একে বাইআতে সুলুক তথা আত্মশুদ্ধির বাইআত বলা হয়। সুরা মুমতাহিনা (আয়াত: ১০) এ এই বাইআতের উল্লেখ রয়েছে। জ্ঞাতব্য বিষয় যে, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে আত্মশুদ্ধির বাইআত হননি, যারা হয়েছেন হাদিসে তাদের নামের সাথে এও উল্লেখ আছে।(১)

মূর্খতার কারণে কিংবা বিভিন্ন বাহানায় তরিকতের মধ্যে যেসব ভুল চিন্তা, ভ্রান্ত মতবাদ, মুনকার রেওয়ায়েত, গর্হিত কাজ-কর্ম এবং অনর্থক রসম ও রেওয়াজের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তা থেকে পাক-সাফ থাকা-ই হজরত গাঙ্গুহি রাহিমাহুল্লাহুর সিলসিলায়ে তরিকতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আর এটি সকল যুগের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকাবির ও মাশায়েখের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যও বটে। তাই আমাদের উপর ফরজ হল আমরা যেন এর প্রতি লক্ষ্য রাখি।

এটি শরিয়তের দৃষ্টিতেও ফরজ। আবার সিলসিলার উসুল অনুযায়ীও ফরজ। আর আকাবিরের উসুল তো শরিয়তের দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে-ই হয়ে থাকে। অন্যথায় তারা আমাদের আকাবির ও অনুসরণীয়ই বা হবেন কীভাবে? ফারসি একটি কবিতা আছে, যার ভাবার্থ হল: পিরের কথা ও কাজ দলিল নয় (যদি সুন্নাহ-নির্ভর না হয়)। আল্লাহর বাণী ও রসুলের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধর।

---

(১) যেমন: আউফ বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু (সহিহ মুসলিম: ২৪৫০, সুনানে আবু দাউদ: ১৬৪৪), হজরত জারির বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু (সহিহ বুখারি: ৫৭, সহিহ মুসলিম: ৯৭), হজরত উবাদা বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু (সুনানে নাসাই: ৪১৭৮।)

এটি তো দেওবন্দি মাকতাবায়ে ফিকিরের অতি প্রসিদ্ধ ও সর্বজন গৃহীত দর্শন। যেমন: জিকিরের কালেমাসমূহ সহিহ-শুদ্ধ এবং তাজবিদের সাথে উচ্চারণ করা জরুরি। এতে কোন প্রকার অবহেলা করা উচিত নয়। সাধারণ লোকদেরকে কুরআন সহিহ-শুদ্ধ করা এবং জিকিরের শব্দসমূহ সহিহ-শুদ্ধ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা জরুরি।

তেমনিভাবে জিকির আস্তে বা উঁচু আওয়াজ উভয় পদ্ধতিতে জায়েজ হলেও চিৎকার করে জিকির করা কিন্তু নিষিদ্ধ। (জিকির তো ওয়াজ নয়, এটি হল এবাদত। তাই এতে স্পিকার ব্যবহার করা বিশেষত আওয়াজ যদি হালকার বাইরে পৌঁছে থাকে, তবে তা কোনভাবে-ই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।) এ থেকে বিরত থাকা জরুরি। জিকিরের সময় যদি অনিচ্ছায় কারো *ওয়াজদের* অবস্থা সৃষ্টি হয়, তবে সে মাজুর। কিন্তু কৃত্রিমভাবে এমন করা হারাম। এমনকি এই অবস্থা কামনা করাও ঠিক নয়, বরং জিকিরের সময় স্থিরতা ও গাম্ভীর্য কাম্য।(১)

অলীক কল্পকাহিনী যদ্দারা আকিদা-বিশ্বাসের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি হওয়ার কিংবা শরিয়ত পরিপালনে উদাসীনতা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা হয়, তা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। কোন কিছু বয়ান করতে হলে দায়িত্বশীলতার সাথে তাহকিক করার পর বয়ান করা উচিত। কোন রেওয়ায়েত কিংবা কোন মাসআলা তাহকিক করা ছাড়া বলা-করা নাজায়েজ।

আর শুধু জিকিরকে-ই যথেষ্ট মনে করা জায়েজ নয়। আকিদা পরিশুদ্ধ করা, ফরজ-ওয়াজিবসমূহের প্রতি গুরুত্ব দেয়া, হকসমূহ আদায় করা, মুআমালা-লেনদেনে স্বচ্ছতা, গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে

---

(১) এ বিষয়ে আরো দেখুন: সিবাহাতুল ফিকরি ফিলজাহরি বিজজিকরি, পৃ. ৯, আবদুল হাই লাকনাভি রাহিমাহুল্লাহ।

থাকা, সামাজিকতার ক্ষেত্রে ইসলামের তালিম ও শিক্ষা মেনে চলা এবং আত্মার ব্যাধিসমূহের সংশোধন করা এবং এর প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া তরিকতের প্রতীক ও শিআর হওয়া উচিত।

শরিয়ত ও সুন্নতের অনুসরণ-ই হল আমাদের কাজ। আর শরিয়তের দলিল-প্রমাণসমূহ হল আমাদের দলিল। সুতরাং ফরজে আইন পরিমাণ ইলমের ব্যাপক প্রচার-প্রসার করা জরুরি। এ বিষয়ে মুরিদদেরকে কোন ছাড় দেয়া উচিত নয়। এটি তো অতি লজ্জার বিষয় যে, কেউ বারো তসবিহ অতি গুরুত্বের সাথে আদায় করে। অথচ কুরআনের তিলাওয়াত শিখে না। দস্তরখান ব্যবহারের সুন্নত হাতছাড়া করে না। কিন্তু হালাল-হারামের মাসআলা জানে না! আর কার্যকরভাবেও এর প্রতি যত্নশীল হয় না। পাগড়ির সুন্নত ভুলেও ছুটে না। কিন্তু নামাজের রোকন ও ওয়াজিবসমূহ আদায় এবং নামাজের সুরা-কিরাআত শুদ্ধ করার প্রতি কোন গুরুত্ব নেই।(১)

সমাজে তাসাউফ সম্পর্কে বহু মৌলিক ভ্রান্তি রয়েছে। সেগুলোর সংশোধন হওয়া খুবই জরুরি। অনেকের ধারণা যে, তাসাউফের বিধি-বিধান ও শিক্ষা-দীক্ষা কুরআন-হাদিসের পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দার্শনিক ও যোগীদের ধ্যান-ধারণা ও সাধনা ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত। এই ভুল ধারণার কারণে অনেকে একে বিদআত ও গোমরাহি বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। তাদের এই ভ্রান্তির মূল কারণ হল, হকপন্থিগণ যে তাসাউফের কথা বলে থাকেন, সে তাসাউফের হকিকতের ব্যাপারে তারা উদাসীন।

দ্বিতীয়ত: তাদের দৃষ্টি মূলতত্ত্ব ও অর্থের প্রতি নয়, বরং বাহ্যিক শব্দাবলির প্রতি দৃষ্টি রেখে-ই তারা এ জাতীয় মন্তব্য করে থাকেন। কারণ তারা যখন তাসাউফের ভিত্তি কুরআন-হাদিসে দেখতে চান, তখন তারা তাসাউফ শব্দ বা পির-মুরিদি শব্দসমূহ সন্ধান করতে

---

(১) মাওলানা আবদুল মালেক সাহেব জিদা মাজদুহুম: মাসিক আলকাউসার: ২০১২।

থাকেন। আর কুরআন-হাদিসে এ সব শব্দ না পেয়ে তারা তাসাউফকে বিদআত ও গোমরাহি বলে আখ্যায়িত করেন। অথচ এ কথা সুস্পষ্ট যে, এগুলো শুধু পারিভাষিক শব্দ। এগুলোর মূলতত্ত্ব ও অর্থ যদি কুরআন-হাদিসে বিদ্যমান থাকে, তাহলে এ সব শব্দ বিদ্যমান না থাকায় কোন অসুবিধা নেই। এও একটি কারণ যে, তাসাউফের দাবিদারদের এমন একটি দল অতিবাহিত হয়েছে এবং এখনো রয়েছে, যারা বিভিন্ন রসম-রেওয়াজ, বিদআত, বাতিল আকিদা-বিশ্বাস এবং কার্যকলাপকে তাসাউফ নাম দিয়ে রেখেছে। অথচ প্রকৃত তাসাউফ বা হক্কানি পির-মুরিদির সাথে এগুলোর অদৌ কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তাই বলে তো একটি শাশ্বত সত্যকে বদদীন লোকদের বাড়াবাড়ির কারণে কোনক্রমে-ই অস্বীকার করা যায় না। হ্যাঁ, বাড়াবাড়ির প্রতিবাদ ও খণ্ডন অবশ্যই করতে হবে।(১)

ছাত্রদেরকে বাইআত করা প্রসঙ্গ

বর্তমানে পির হজরতরা ছাত্রদেরকে চাপ প্রয়োগ করে হলেও নিজেদের হাতে বাইআত করিয়ে থাকেন। এ বিষয়ে হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু বলেন: আমাদের আকাবিররা কোন তালেবে ইলমকে ছাত্র থাকাকালে বাইআত করেননি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে মুরিদ-সংখ্যা বাড়ানোর ধান্ধায় উন্মুক্তহারে ছাত্রদের বাইআত নেয়া হচ্ছে। বরং এ নিয়ে রীতি মতো প্রতিযোগিতা চলছে! (২)

হজরত থানভি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ছাত্র থাকা অবস্থায় হজরত মাওলানা গাঙ্গুহি রাহিমাহুল্লাহর কাছে বাইআত হওয়ার আবেদন করলে তিনি বলেন, যতক্ষণ কিতাবসমূহ শেষ না হবে, এই খেয়ালকে শয়তানি খেয়াল মনে করবেন।(৩)

---

(১) তাসাউফ তথ্য ও বিশ্লেষণ, পৃ. ৫৩, শাইখ আবদুল মালেক সাহেব হাফিজাহুল্লাহ।
(২) দেওবন্দিয়াত কিয়া হেঃ বয়ান।
(৩) আলইলমু ওয়াল উলামা, পৃ. ১৯১।

অবশ্য ছাত্রকালেও আত্মশুদ্ধি আবশ্যক। তবে এর জন্য বাইআত হওয়া শর্ত নয়। (১)

---

(১) আলইলমু ওয়াল উলামা, পৃ. ১৯২।

পির-মুরিদদের সম্মিলিত জিকিরের হুকুম

আজ আমরা জিকির-আজকারেও কুরআন-সুন্নাহর পদ্ধতি ছেড়ে নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছি। অথচ সুন্নাহর খেলাপ কোন আমল-ই গ্রহণযোগ্য নয়। হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু বলেন: এখন আমাদের ঘরানাতেও বড় বড় কিছু আলেম লাউড স্পিকার নিয়ে বসে জিকির করান। সমস্ত মুরিদ বসে থাকেন। আর তিনি বলেন: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সবাই বলে: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই পদ্ধতি বিদআত। আমি কারো নাম নিতে চাচ্ছি না। যত বড় ব্যক্তি-ই করিয়ে থাকেন না কেন? এই পদ্ধতিতে জিকির করানো বিদআত। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে-ই প্রতিবাদ করেছিলেন। এক ব্যক্তি মসজিদে এভাবে জিকির করাচ্ছিল যে, সবাই বলুন: সুবহানাল্লাহ! সবাই সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলতে লাগল। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই জিকিরের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন।

আজ থেকে পঁচিশ বছর বছর পূর্বে ফিলিসতিনের মাওলানা ইসমাইল ওয়াদিওয়ালা নামে একজন বুজুর্গ ছিলেন। আমি রমজান মাসে (ইংল্যান্ডের) বোল্টনে থাকতাম। তিনি আমার কাছে আসতেন, তার সাথে আমার ভালো সম্পর্কও ছিল। একবার আমি ফিলিসতিনে বয়ান করতে যাই। দুটো মসজিদে তার দশ-বারোজন মুরিদ ছিল, তারা গোলাকার হয়ে বসত। আর তিনি তাদেরকে জিকির করাতেন: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তারাও বলত: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! তারপর তিনি বলতেন: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তারাও বলত: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! এটি ভুল পদ্ধতি। জিকির একাকী করা-ই এবাদত। আর যদি একত্রিত হয়ে কিছু লোক এখানে, কিছু লোক ওখানে বসে যার যার জিকির করেন, তাহলে করতে পানের। এটা সম্মিলিত জিকির নয়। সম্মিলিত জিকির যে ব্যক্তি-ই করান না কেন? চাই তিনি বড় কেউ হোন অথবা হোন কোন মুফতি সাহেব! এটা গলদ তরিকা। এটা দেওবন্দিয়াত নয়। আমি তো পঞ্চাশ বছর থেকে দারুল উলুম দেওবন্দের আকাবিরদেরকে দেখে আসছি, কোথাও সম্মিলিত জিকির ছিল না। কিন্তু এখন তা শুরু

হতে চলছে! দেওবন্দিদের মধ্যেও সম্মিলিত জিকির শুরু হচ্ছে! এটা বিদআত। এ থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে।

হ্যাঁ, এতটুকু দেখেছি যে, আমাদের বড়দের মধ্য থেকে হজরত শাইখ কুদ্দিসা সিররুহুর সাথে যারা তওয়াফ করতেন, তারা জোহরের পর জিকিরে লিপ্ত হতেন। সবাই নিজেদের জিকির করতেন। এটা সম্মিলিত জিকির নয়, এটা তো এক জায়গায় বসে যার যার জিকির। যেমন: নামাজ শেষে প্রত্যেক বান্দা দুআ করে থাকে। এটা সম্মিলিত দুআ নয়, এটা তো যার যার প্রার্থনা। সবাই এক সাথে হাত উঠিয়ে রাখার কারণে দৃশ্যত সম্মিলিত দুআ বুঝা যায়। কিন্তু এটা সম্মিলিত দুআ নয়, বরং প্রত্যেকের আলগা দুআ।

তো হজরত শাইখের ওখানে আমরা এটা দেখেছি। মসজিদে পাঁচ থেকে সাতশত লোক সবাই নিজেদের জিকির করতেন। ডানে-বামের কোন খবর নেই। কারো জিকির আগে শুরু হত। আবার কারো পরে শেষ হত। এটা সম্মিলিত পদ্ধতি নয়। সম্মিলিত জিকির হল যে, লাউড স্পিকারে পির সাহেব বলবেন: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! অতঃপর সবাই এক সাথে বলবে: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! এই পদ্ধতি নব-আবিষ্কৃত, যা দেওবন্দিদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে!

আমার ভাইয়েরা! যতটুকু আমার আওয়াজ পৌঁছানোর ততটু আমার আওয়াজ পৌঁছিয়ে দাও যে, এটা গলদ তরিকা। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর বিরুদ্ধে-ই প্রতিবাদ করেছিলেন।([১])

---

(১) হজরতের বয়ানের লিঙ্ক: https://youtu.be/FoFllrVB0Dc শাইখের বক্তব্যের সমর্থনে দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়াও পাওয়া যায়। দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া বিভাগ থেকে বলা হয়েছে যে, কোন শাইখের সাথে এভাবে সম্মিলিত জিকির করা উত্তম নয়। প্রত্যেককে যার যার জিকির করতে হবে।(http://www.darulifta-deoband.com/home/ur/Tasawwuf/2284) বয়ানের অনুবাদ করেছেন মাওলানা কাবির আহমাদ কাসেমি হাফিজাহুল্লাহ।

(তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

তাসাউফ: সালাফি মতাদর্শ

আমাদের অনেকের ধারণা যে, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া হামবলি রাহিমাহুল্লাহ তাসাউফ-বিরোধী ছিলেন! এমন ধারণা সঠিক নয়, বরং ইবনে তাইমিয়া এবং সালাফি উলামায়ে কেরামগণ সঠিক তাসাউফের প্রবক্তা ছিলেন, যতটুকু কুরআন-হাদিস সমর্থন করে। আর আমাদের তাসাউফও তো তাই। তাসাউফের সমালোচনায় তাদের কথাগুলো অনারবিদের ভ্রষ্ট তাসাউফের বিরুদ্ধে, সঠিক তাসাউফের বিরুদ্ধে নয়।

শাইখ আবদুল হাফিজ মক্কি রাহিমাহুল্লাহ বিরচিত *মাওকিফু আইম্মাতিল হারাকাতিস সালাফিয়াতি মিনাত তাসাউফে ওয়াসসুফিয়া* নামক বইয়ে সঠিক তাসাউফের সমর্থনে তাদের উক্তিগুলো রয়েছে। বইয়ে লেখক শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম ইবনে কাসির, ইমাম জাহাবি, ইবনুল কায়্যিম, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এবং ইমামুদ দাওয়াহ আবদুল ওয়াহহাব নজদি রাহিমাহুল্লাহর লিখনী এবং বক্তব্য থেকে নির্ভেজাল তাসাউফ প্রমাণ করেছেন।

আবার অনেকের ধারণা যে, তাসাউফ বলতে-ই ভ্রান্ত এবং সুফিরা পৃথক একটি গোমরা ফিরকা, বরং তারা দীনের শত্রু! তাদের উৎস ইউনান অথবা হিন্দুস্তানের সাথে সম্পৃক্ত! এমন অনেক অহেতুক কথা শোনা যায়। অত্যন্ত দুঃখজনক হল যে, সালাফি ভাইয়েরা তাদের নামে এ সব কথা প্রচার করছেন যে, উম্মাহর বড় বড় সালাফরা তাসাউফ বিরোধী ছিলেন! অথচ বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা সালাফি উলামাদের দৃষ্টিতেও সুফিবাদ অন্যান্য ইসলামি দলের মতো একটি দল। যেমন: মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুতাকাল্লিম, ইতিহাসবিদ, মুজাহিদ প্রমুখ। হ্যাঁ, তাদের কেউ সঠিকতায় পৌঁছেছেন। আবার কারো থেকে বিচ্যুতিও হয়েছে। কেউ সৎ ছিলেন। আবার কেউ ছিলেন অসৎ। কেউ ছিলেন আসল, কেউ তো আবার নকল! সুফি দ্বারা ঐ সমস্ত লোকদের

উদ্দেশ্য নেয়া যাবে না, যারা কিতাবুল্লাহ এবং রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ-বিরোধী ছিলেন।

তাসাউফ: ইবনে তাইমিয়ার অবস্থান

অনেকের ধারণা যে, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ পির-মুরিদির বিরোধী ছিলেন! তাদের এই ধারণা সঠিক নয়। আগেও বলেছি যে, তিনি ভ্রান্ত পির-মুরিদির বিরোধী ছিলেন, বিশুদ্ধ পির-মুরিদি তিনি অস্বীকার করতেন না। ডক্টর আহমাদ মুহাম্মাদ বুনানি রাহিমাহুল্লাহ লিখেন: আমার কাছে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ ঢালাওভাবে তাসাউফ-বিরোধী ছিলেন না, বরং তিনি তাসাউফের সেসব বিষয় অস্বীকার করতেন, যা কিতাব এবং সুন্নাহ-পরিপন্থী ছিল এবং যা সাহাবা এবং তাবেয়িন কারো থেকে পাওয়া যায়নি।

তিনি আরো লিখেন: অতঃপর তাসাউফের বিষয়ে আমার কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, ইমাম ইবনে তাইমিয়া আত্মশুদ্ধির বিশুদ্ধ পথ অবলম্বন করেছিলেন, যা কিতাব-সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত। এতে তিনি সুফিদের মধ্যপন্থী একটি দলের সাথে সহমত পোষণ করেছেন। আবার অন্য একটি দলের বিরোধিতাও করেছেন, যারা এমন পথ গ্রহণ করেছিল, যার ওপর ভরসা করা যায় না।(১)

ইমাম জাহাবি ও তাসাউফ

এমনিভাবে ইমামুল জারহি ওয়াত তাদিল শামসুদ্দিন জাহাবি রাহিমাহুল্লাহও তাসাউফ-বিরোধী ছিলেন না। শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ হালবি রাহিমাহুল্লাহ লিখেন: হাফিজ জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন ইসলামের বড় মাপের একজন ইমাম। তিনি সৎ, পরহেজগার এবং আল্লাহওয়ালা ছিলেন। তবে নিষ্পাপ ছিলেন না। তিনি নেককার

---

(১) মাওকিফুল ইমামিবনি তাইমিয়াতা মিনাত তাসাউফি ওয়াসসুফিয়া, পৃ. ১৫, ডক্টর আহমাদ মুহাম্মাদ বুনানি, দারুত তাবাআতি ওয়ান নাশর মক্কা।

ও পরহেজগার সুফিদেরকে খুব-ই ভালোবাসতেন। তাদের ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ করতেন এবং মানুষকেও তাদের প্রতি উত্তম ধারণা রাখতে নির্দেশও দিতেন। এটা তার দীনদারি, পরহেজগারি, আল্লাহভীতি এবং তাদের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এতদসত্ত্বেও তিনি তাদের পদস্খলন, অমনস্কতা এবং কুরআন-হাদিসের বিরুদ্ধাচরণ বিষয়ে আশঙ্কা করতেন এবং মানুষকেও সতর্ক করতেন।

সুফিদের প্রতি জাহাবির ভূয়সী প্রশংসার কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি আরো লিখেন: কিন্তু তিনি নেককার, সত্যবাদি এবং সঠিক পথের অনুসারী সুফিদের সাথে এমন গভীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও কোন সুফি বক্রতার বাতাসের ঘ্রাণ নিলে বা পবিত্র শরিয়তে অনধিকার চর্চার চেষ্টা করলে আপনি তাকে তার বিরুদ্ধে শক্তিশালী সিংহের মতো গর্জে উঠতে দেখবেন। আল্লাহ তাআলা তার কল্যাণ করুক। তিনি শরিয়তের কত-ই না হেফাজত ও রক্ষা করেছেন। আল্লাহ তাআলা তার ধার্মিকতা, সাধনা এবং আল্লাহভীতি থেকে আমাদেরকে উপকৃত করুন।(১)

বর্তমান যুগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, ডক্টর বাশার আওয়াদ মারুফ বাগদাদি হাফিজাহুল্লাহ তার সম্পর্কে লিখেন: সর্বাবস্থায় সুফিদের ব্যাপারে জাহাবির বক্তব্য সঠিক ছিল, যেমন বলেছেন ইমাম সুবকি। আর তা ছিল সংখ্যালঘু সুফিদের ব্যাপারে। এটা একটি মত, যা তিনি গ্রহণ করেছেন এবং তিনি এর ওপর অটল এবং এর বিশ্বাসীও ছিলেন। তিনি সুফিদের উভয় গ্রুপের মাঝে পার্থক্যও করেছেন:

১- যারা সোজাসুজি দীনকে ধারণকারী এবং সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন, তাদের প্রতি জাহাবি পরিপূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করতেন। তিনি নিজেও শাইখ জিয়া উদ্দিন ইসা বিন ইয়াহয়া আনসারি

---

(১) বিস্তারিত জানতে পড়ুন: আররাফউ ওয়াত তাকমিল ফিল জারহি ওয়াত তাদিল, পৃ. ৩১১-৩১২, ইমাম লাকনাভি, তাহকিক-তালিক: আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ হালবি, ইত্তিহাদ বুক ডিপো দেওবন্দ।

সাবতি থেকে তাসাউফের পাগড়ি গ্রহণ করেছিলেন, যখন তিনি মিশর সফর করেছিলেন।

২- যাদেরকে জাহাবি ধর্মত্যাগী, ভেলকিবাজ এবং উন্মাদ আখ্যায়িত করেছিলেন।(১)

(১) আজজাহাবি ওয়া মানহাজুহু ফি কিতাবিহি তারিখিল ইসলাম, পৃ. ৪৬৩, আররাফউ ওয়াত তাকমিলের টীকার সূত্রে (পৃ ৩১২।)

(চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

শোকসভার হুকুম

এমনিভাবে কোন আলেম বা বুজুর্গ মারা গেলে শোকসভা/ জীবনীশীর্ষক সভা/স্মরণসভার আয়োজন করাও আমাদের মতাদর্শে নেই। এ বিষয়ে উসতাজে মুহতারাম স্বতন্ত্র একটি বইও লিখেছেন, যা অধমের অনুবাদে মাকতাবাতুস সুন্নাহ ঢাকা থেকে প্রকাশিত। এখানে আমরা অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বিষয়টি পেশ করব, ইনশাআল্লাহ।

উসতাজে মুহতারাম লিখেন: মার্সিয়া তথা কেউ মারা গেলে শোকসভা করার ব্যাপারে হাদিসে নিষেধ এসেছে। *আলকাসিম ম্যাগাজিনে* যে বিবৃতি ছেপেছে, সেখানে স্বজোরে মাতমের কথাও রয়েছে। তাহলে শোকগাথা এবং এর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আর বুজুর্গদের আমলের ব্যাপারে বলব যে, তখন মাসআলা পরিস্ফুটিত হয়নি বলে এমন করা হয়েছে। আমার কাছেও এই মাসআলা নিখাদ না হওয়া পর্যন্ত শোকসভায় অংশগ্রহণ করতাম, বরং কিছু জায়গায় বক্তৃতাও দিয়েছি। এখন বিষয়টি পরিষ্কার হলে আমি কুরআন-হাদিসের ওপর আমলে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি।

শোকসভার ব্যাপারে আকাবিরদের বক্তব্য যে, আমাদের আমল *তোমরা মৃত ব্যক্তির গুণাগুন বয়ান কর* (১) এর সমান্তরাল। যদি এই হাদিসের গরজ এই হয়, তাহলে *তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম*

---

(১) সুনানে আবু দাউদ: ৪৯০০, জামে তিরমিজি: ১০১৯। হাদিসটি অত্যন্ত দুর্বল। ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটি তাখরিজ করে বলেন: আমি মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারি রাহিমাহুল্লাহ থেকে শুনেছি যে, এই হাদিসের একজন রাভি ছিল- ইমরান বিন আনাস আলমাক্কি- মুনকারুল হাদিস ।

(২) মুসনাদে আহমাদ: ১৯১৪০, সিলসিলাতুল আহাদিসিজ জায়িফাতি ওয়াল মাওজুআতি ওয়া আসারুহাস সাইয়িউ ফিল উম্মাহ, ১০/২৭২, শাইখ আলবানি।

মার্সিয়া থেকে নিষেধ করেছেন (১) এর উদ্দেশ্য কী? দুই হাদিসের পরস্পর বৈপরিত্ব দেখা দেয়ায় পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা করা জরুরি বটে।

যদি কেউ বলেন যে, *তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মার্সিয়া থেকে নিষেধ করেছেন:* হাদিসটি দুর্বল। তাহলে *তোমরা মৃত ব্যক্তির গুণাগুন বয়ান কর* এই হাদিসকেও দুর্বল বলা হবে! দুই হাদিস বরাবর হওয়ায় আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করা জরুরি বটে। আর যে সভার রিপোর্ট *আলকাসিমে* প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে উর্দু, আরবি এবং ফারসি শোকসঙ্গীত পাঠ করা হয়েছে এবং এর ওপর অনেক মাতমও করা হয়েছিল, তাহলে এক হাদিসের ওপর আমল করা হল ঠিক। কিন্তু অন্য হাদিসের বিপরীত তো হয়ে-ই গেল!(২)

---

(২) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে, পৃ. ৪।

অস্বীকৃত কাজের বারণ জরুরি

উসতাজে মুহতারাম লিখেন: দারুল উলুম দেওবন্দের রেভলিউশন তথা বিপ্লবের আগে হাকিমুল ইসলাম কারি তায়্যিব রাহিমাহুল্লাহুর নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত হল যে, দারুল উলুমের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পনেরো মুহররমে উৎসবের আয়োজন করা হবে! বড়রা সবাই এ ব্যাপারে সহমত পোষণ করে-ই ফেলেছেন! যদি এই ধারাবাহিকথা চালু হয়ে যেত, তাহলে বর্তমানে পরিস্থিতি কী দাঁড়াত? তা অনুমান করা মুশকিল কিছু নয়।

আমি তখন ছিলাম ছোট একজন শিক্ষক। এতদসত্ত্বেও কারি তায়্যিব রাহিমাহুল্লাহুর সাথে এ ব্যাপারে দীর্ঘ কথাবার্তা বলি। অবশেষে এই ধারা বন্ধ করে দিয়েছি। হজরত প্রকল্পিত প্রোগ্রাম স্থগিত করে দেন। এটা তার বিস্তৃত বিচক্ষণতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তিনি আমার মতো অনর্থক লোকের কথাও সানন্দে গ্রহণ করেছেন। ফলে ভবিষ্যতের শঙ্কা বন্ধ হয়ে গেল।(১)

কথিত পাঁচ রুপির ঘটনা!

উসতাজে মুহতারাম লিখেন: এলাহাবাদের জনৈক এক ব্যক্তি রৌপ্যের পাঁচ টাকা নিয়ে দারুল উলুম দেওবন্দে আসে এবং হাকিমুল ইসলামকে দিয়ে বলে যে, আমার কাছে সজাগ অবস্থায় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে এই রুপি দিয়েছেন! আর বলেছেন যে, এর এক টাকা শতবার্ষিকী মাহফিলে এবং এক টাকা কারি তায়্যিবকে দিতে...। ঐ দিন-ই বিকালে পুরাতন দারুল হাদিসের নিচে একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। মাওলানা সালিম কাসেমি কুদ্দিসা সিররুহু এতে ভাষণ দেন। ফলে অনেক চাঁদা উঠে। পরের দিন সকালে আমি *আততালিকুস সাবিহ* কিতাব নিয়ে হাকিমুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহুর কাছে গমন করি এবং সজাগ অবস্থায় নবি সাল্লাল্লাহু

(২) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে, পৃ. ৪।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের কথা দেখাই।(১) আর্জি করলাম, বর্তমানে তো নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য জগতে। অন্য জগতের বস্তু এ দুনিয়ায় আসতে পারে। যেমনঃ হজরে আসওয়াদ জান্নাতি পাথর বলে রেওয়ায়েতে এসেছে।(২) কিন্তু ইণ্ডিয়ার মুদ্রা প্রস্তুতকারী টাকশালের ছাঁচে ঢালা মুদ্রা, যাতে আবার রয়েছে তিন ব্যাঘ্রাকৃতি, সালও মুদ্রিত। এই মুদ্রা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মালিকানায় পৌঁছল কেমনে?! আবার তিনি ঐ ভদ্র লোককে দিলেন কীভাবে!? নিশ্চয় সে ধোঁকাগ্রস্ত হয়েছে!(৩)

হাকিমুল ইসলামের বিচক্ষণতা

আমার এই কথাও হাকিমুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ সানন্দে কবুল করেছেন। দ্বিতীয় দিন বাদ মাগরিব দারুল হাদিসের উপর-কক্ষে সভার আয়োজন করা হয়। এতে মাওলানা সালিম কাসেমি রাহিমাহুল্লাহ ভাষণ প্রদান করেছেন। তিনি পরিষ্কার শব্দে বলেছিলেন যে, গতকাল আমরা মহব্বতের আধিক্যে তা মেনে নিয়েছিলাম, এখন তা আর সামনে বাড়ানো যাবে না।(৪)

---

(১) বিস্তারিত দেখুনঃ আততালিকুস সাবিহ, ৫/৯০, মাকতাবা আলফাখরিয়া দেওবন্দ, লুমআতু তানকিহ ফি শরহি মিশকাতিল মাসাবিহ, ৭/৫৬৮, দারুন নাওয়াদির, আল্লামা ইউসুফ বানুরিঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৯৬, মাওলানা আবদুল কায়্যুম হক্কানি, মাকতাবাতুল হেরা ঢাকা।

(২) সুনানে তিরমিজিঃ ৮৭৭, সুনানে নাসাইঃ ২৯৩৫। হাদিসটি সহিহ।

(২) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে, পৃ. ৪।

(৩) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে, পৃ. ৪।

সালিম কাসেমির ওপর অনুষ্ঠিত শোকসভা

উসতাজে মুহতারাম লিখেন: মাওলানা সুফিয়ান কাসেমি জিদা মাজদুহু (শোকসভার ব্যাপারে) আমাকে যে জবাব দিয়েছেন, এর সারকথা হল, আকাবিরদের সিরাত তথা জীবনচরিত সংরক্ষণ করা জরুরি, তাদের অনুসরণ করার লক্ষ্যে। সেমিনার আয়োজনের উদ্দেশ্যও এটা-ই। তিনি সাথে পাঠব্য শিরোনামের সূচীও পাঠিয়েছেন। এর যৌক্তিক জবাব হল যে, এর জন্য আমাদের কাছে ম্যাগাজিন রয়েছে, এতে প্রবন্ধ প্রকাশ করা হোক, আকাবিরদের জীবনবৃত্তান্ত লেখা হোক। জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করা উম্মাহর অবিচ্ছেদ্য আমল দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এই পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে আকাবিরদের জীবনী সংরক্ষণ করা যেতে পারে।(১)

মাতম নিষিদ্ধের কারণ?

উসতাজে মুহতারাম লিখেন: শরিয়তে মাতম করা নিষিদ্ধ। সুতরাং শোকসভার ব্যাপারে আমার শরহে সদর হয়নি। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি রাহিমাহুল্লাহ মাতম নাজায়েজ হওয়ার তিনটি কারণ বয়ান করেছেন:

১- *এর দ্বারা আত্মবিস্মৃত দুঃখ তাজা হয়। আত্মীয়-স্বজনরা শোকে সন্তপ্ত। তাই তাদের শোক ও বেদনায় বৃদ্ধি করা কোনোক্রমে-ই উচিত মনে হয় না। শোকসভায় অন্যান্য কুসংস্কারের সাথে সাথে তাও পাওয়া যায়।* এজন্য এই মাসআলায় আমার মত এটাই যে, শোকসভা করা জায়েজ নয়।(২)

২- কখনো বেপরোয়া ক্রন্দন: আল্লাহর ফয়সালার বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট

(১) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে, পৃ. ৫।

(২) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে, পৃ. ৫।

থাকা জরুরি। অতএব, এতে যে বস্তু বাধা সৃষ্টি করবে, তা নিষিদ্ধ হওয়ার-ই কথা।

৩- মূর্খতার যুগে মানুষ বানোয়াট দরদ এবং শোকের বহিঃপ্রকাশ করত। এমন করা ক্ষতিকর ও বদ অভ্যাস। এজন্য শরিয়ত মাতম এবং আহাজারী থেকে নিষেধ করেছে।(১)

(১) রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ, ৩/৬৮৮, তুহফাতুল কারি, ৪/৪৮।

কুসংস্কারের সংশোধন কীভাবে করব?

শাহ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ লিখেন: কুসংস্কার ও রীতিনীতির সংশোধন করা অত্যন্ত ভালো কাজ। যেসব লোক ধর্মের কল্যাণে কাজ করেন এবং যারা জাতির সংশোধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাদের জন্য হকের প্রচার-প্রসার করা এবং বাতিলকে বাঁধা ও তাদেরকে নির্মূলে করে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা-সাধনা করা জরুরি।

এ কথা স্মরণে রাখা উচিত যে, যখন বিদআত এবং কু-প্রথা কোন জাতির মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন তা নির্মূল করা কঠিন এবং অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কখনো ঝগড়া-ঝাটি এবং যুদ্ধের পালাও এসে থাকে। এজন্য সংশোধনকারীদের নৈরাশ না হওয়া চাই। আমবিয়া আলাইহিমুস সালাম কখনো সাহসহারা হননি। আবার ঢাল হাত ছাড়াও করেননি। তাহলে তাদের উত্তরসূরিরা পিছপা হবেন কেন? এ সব ঝগড়া-বিবাদ উৎকৃষ্ট মানের নেক কাজের আওতাভুক্ত। হ্যাঁ, নিজেদের তরফে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় না যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। বরং পিয়ার ও মহব্বতের সাথে মানুষকে সুন্নাহর পথে রাহনুমায়ি করা এবং বিদআত ও রীতিনীতির অনিষ্টতা সম্পর্কে বুঝানো উচিত। কিন্তু যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা দাঙ্গায় অবতীর্ণ হয়, তাহলে বীরত্বের সাথে তাদের মোকাবেলা করতে হবে। এটাও এক প্রকারের জিহাদ।(১)

---

(১) রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ, ১/৫০৮।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

আত-তালাক্কি আনিস সালাফ

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু বলেনঃ দেওবন্দিয়াতের প্রধান বিষয়বস্তুর তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, اَلتَّلَقِّيْ عَنِ السَّلَفِ তথা সালাফে সালেহিন থেকে দীনী বিষয় গ্রহণ করা। সালাফ দ্বারা সাহাবা, তাবেয়ি এবং তাবে তাবেয়িন উদ্দেশ্য। বাকি সবাই খালাফ। সারকথা হল, সালাফ থেকে বিশুদ্ধ এবং ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণিত দীনি ঘটনাবলী বা দীনি বিষয়বস্তু গ্রহণ করা। বল মাটিতে পতিত হওয়ার আগে আগে ক্যাচ করে নিলে বল থাকে ময়লামুক্ত। অন্যথায় হয়ে যায় ময়লাযুক্ত, সাথে হাতও হয় ময়লাযুক্ত। এমনিভাবে সালাফ থেকে যেসব বিশুদ্ধ ঘটনাবলী ময়লামুক্ত তথা সহিহ সনদের সাথে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছবে, তা-ই গ্রহণ করা হবে। একে বলে আত-তালাক্কি আনিস সালাফ।(১)

সালাফের অনুসরণঃ দারুল উলুম দেওবন্দের উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে

উলামায়ে দেওবন্দ সালাফ থেকে-ই এই দীন গ্রহণ করেছেন। দারুল উলুম দেওবন্দের শতবার্ষিকী উপলক্ষে *মাসিক আদদায়ি* ম্যাগাজিনের বিশেষ সংখ্যায় একটি নিবন্ধ ছাপা হয়, যার শিরোনাম ছিল *সালাফের অনুসরণ: দারুল উলুম দেওবন্দের উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে*। প্রবন্ধটি নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

> এই জামাআত কুরআন-সুন্নাহ থেকে আলো গ্রহণ ব্যতিরেকে সালাফ ও ব্যক্তিত্বের ওপর পরিপূর্ণরূপে ভরসা করেনি। তারা কুরআন-সুন্নাহ বুঝার ক্ষেত্রে সালাফের ইলমি ঐতিহ্য, রুচি ও নির্দেশনার মুখাপেক্ষিহীন হয়ে নিজেদের মতে একগুঁয়েও হয়নি, বরং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সালাফে সালেহের অনুসরণ করা

---

(১) দেওবন্দিয়াত কিয়া হেঃ বয়ান থেকে।

তাদের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। উলামায়ে দেওবন্দ সালাফে সালেহের মত-অভিমত এবং তাদের থেকে প্রাপ্ত অবিচ্ছিন্ন ইলমি রুচির সংমিশ্রণে কুরআন-সুন্নাহর উদ্দেশ্য বুঝার চেষ্টা করে থাকেন। এই সমন্বয়ের ফলে তারা চিন্তা এবং কর্মে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হননি।(১)

ঘটনাবলীর হুকুম

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু আরো বলেন: অলীক কিচ্ছা-কাহিনী সম্পর্কে আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, কিতাবসমূহে যেসব ঘটনাবলী পাওয়া যায়, এর পঞ্চাশ ভাগ-ই বানোয়াট, এর কোন ভিত্তি-ই নেই। বাকি পঞ্চাশ ভাগের ভিত্তি থাকলেও ত্রুটিযুক্ত। কুরআন-হাদিস দিয়ে-ই ওয়াজ-নসিহত করা চাই। হ্যাঁ, কোন বিষয় বুঝাতে গিয়ে কুরআনে কারিমের পদ্ধতি অনুসারে ঘটনা বলা যেতে পারে। তবে তা হতে হবে সাহাবা, তাবেয়ি এবং তবে তাবেয়িদের ঐ সব ঘটনাবলী, যা বিশুদ্ধ সনদের সাথে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছাবে। আমি তো ওয়াজে ঘটনাবলী বলি-ই না, বললেও শুধু তাদের-ই বিশুদ্ধ ঘটনাবলী বলে থাকি।(২)

ঘটনাবলী দ্বারা আকিদা বিনষ্ট হয়

আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, এ সব আজগুবী অলীক কিচ্ছা-কাহিনী দ্বারা কোন আকিদা-বিশ্বাস প্রমাণিত হয় না, বরং স্বতঃসিদ্ধ আকিদা বিনষ্ট হয়। এজন্য ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: সবচে বড় মিথ্যুক হল কাহিনীকার ওয়ায়েজ এবং ভিক্ষাপ্রার্থী। হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন বসরার মসজিদে গমন করেন,

---

(১) মাসিক আদদায়ি, পৃ. ৮০, দারুল উলুম দেওবন্দের শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা। শাইখ সফিউল্লাহ ফুআদ জিদা মাজদুহু থেকে মাওলানা ফখরুল ইসলামের মারফতে গৃহীত।

(২) দেওবন্দিয়াত কিয়া হে: বয়ান থেকে।

তখন সেখান থেকে হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য কাহিনীকারদেরকে বের করে দেন। ([১])

([১]) আলমাদখাল ইলা তানমিয়াতিল আমাল বিতাহসিনিন নিয়াত, ২/১৪৬, ইবনুল হাজ ফাসি মালেকি, মাকতাবাতু দারিস তুরাস মিশর।

পরিশিষ্ট-১

আকাবিরদের তাফাররুদাতঃ আমাদের করণীয়

সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন, তবে তাবেয়িন এবং মুজতাহিদ ইমামগণ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আগন্তুক ব্যক্তিবর্গঃ চাই তিনি মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ইতিহাসবিদ, মুতাকাল্লিম বা ফকিহ হন না কেন, তাদের ব্যাপারে আমাদের উলামায়ে দেওবন্দের আকিদা-বিশ্বাস হল, তারা নিস্পাপ নন। তাদের থেকে ভুল হতে-ই পারে, অনেক থেকে হয়েছেও। উসুল এবং আদাবুল ইখতিলাফ রক্ষা করে তাদের বিরোধিতা করা যাবে। তাদের কথা মানা এবং না মানার ব্যাপারে আমাদের স্বাধীনতা রয়েছে। শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহিমাহুল্লাহ লিখেনঃ আদবের সাথে বড়দের ভুল-ভ্রান্তির সমালোচনা কর। কিন্তু তাদেরকে একেবারে মিটিয়ে দিও না। ([১])

এ জাতীয় পথ ও মত অবলম্বন করা বা কোন মনীষীর বিচ্ছিন্ন মতের অনুসরণ করা জঘন্য অপরাধ। এ বিষয়ে শরিয়তের প্রমাণাদি, সাহাবা তাবেয়ি এবং পরবর্তী উম্মাহর সিদ্ধান্ত এবং বক্তব্য জ্ঞানীদের অজানা নয়। হাফেজ ইবনে আবুদল বার রাহিমাহুল্লাহুর *জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহি*, ২/১৩০ এবং হাফেজ ইবনে রজব দিমাশকি রাহিমাহুল্লাহুর *শরহু ইলালিত তিরমিজি* বিশেষভাবে অধ্যয়ণযোগ্য।(২)

আমাদের করণীয়

আকাবিরদে রচনাবলী, মালফুজাত এবং বয়ানসমগ্রকে আমরা কয়েকভাগে বিভক্ত করে নিতে পারিঃ

([১]) রিসালাতুল মুসতারশিদিন, পৃ. ২৭।

(২) নির্বাচিত প্রবন্ধ (১/২৫৪)।

১- তারা নিজেদের কিতাবে কুরআন-হাদিসের কোন কথা লিখলে তা মানা জরুরি। কারণ তা তাদের কথা নয়, তারা নকল করেছেন মাত্র।

২- তাদের কোন কথা কুরআন-হাদিসের সাথে বাহ্যিক সাংঘর্ষিক হলে যদ্দূর সম্ভব কুরআন-হাদিসের সাথে মিলানোর চেষ্টা করা। সম্ভব না হলে তাদের কথা ছেড়ে কুরআন-হাদিসের ওপর আমল করতে হবে। কিন্তু এ কারণে লেখককে কাফেরও বলব না। আবার তাদের শানে কোন ধরনের গোস্তাকিও করব না।

৩- তাদের কিতাবে যদি এমন কিছু পাওয়া যায়, যা শরিয়তের চার দলিল: কুরআন, হাদিস, ইজমা এবং শরয়ি কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত নয়। আবার বিপরীতও নয়। তবে তা হবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নীতি-বহির্ভূত। তাহলে তা মানা এবং না মানার স্বাধীনতা রয়েছে, তবে আমরা তা মান্য করি।

৪- কোন আলেমের কথায় পরস্পর অমিল দেখা দিলে তার শেষ কথা কী? দেখতে হবে। জানা না থাকলে তা পরিত্যাজ্য হিসেবে গণ্য হবে।

৫- কোন আলেমের বক্তব্য কোথাও সংক্ষিপ্ত, কোথাও বিস্তৃত হলে ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে।

৬- কারো লিখিত বই বা মালফুজাতে বৈপরীত্ব দেখা দিলে লিখিত বইয়ের কথা অগ্রগণ্য হবে।

৭- তাদের ফতোয়া পরস্পর বিরোধী হলে শেষ ফতোয়া গ্রহণ করা হবে অথবা যা হবে তার মাজহাব অনুযায়ী।

৮- সুফিদের নিজস্ব কথা দীনের দলিল হতে পারে না। তাদের কর্তৃক কুরআন-হাদিসের এমন ব্যাখ্যা, যা হাদিসবিশারদ এবং ফকিহদের ব্যাখ্যার সাথে সাংঘর্ষিক, তা পরিত্যাজ্য বলে বিবেচিত হবে। তাদের ঐ কথা-ই গ্রহণযোগ্য, যা হবে কুরআন-সুন্নাহর মোতাবিক।

৯- একই মাজহাবের দুই আলেম ভিন্ন ভিন্ন ফতোয়া দিলে *মুফতা বিহি* বা *মামুল বিহি* বক্তব্য সঠিক হিসেবে ধরা হবে। বাকি বিচ্ছিন্ন মতকে ভুল বা রহিত আখ্যা দেয়া হবে।

১০- আমাদের মতে তাফসিরের বিষয়ে উসুলে তাফসির, হাদিসের বিষয়ে উসুলে হাদিস, ফিকহ বিষয়ে উসুলে ফিকহ, তাসাউফের বিষয়ে উসুলে তাসাউফ এবং ফিকহে হানাফির বিষয়ে ফিকহে হানাফির উসুল ও নীতিনুযায়ী কথা বলা উচিত।(১)

তাফাররুদাতের মর্ম

তাফাররুদ শব্দের সহজ ভাষায় মর্ম হল, বড়দের হাজার সঠিক কথার এক বে-ঠিক কথা। সুতরাং এ বিষয়ে উপরিউক্ত আকিদা অনুযায়ী আমরা আমাদের আসলাফ-আকাবিরদের লিখন বা মালফুজাতে যদি এমন কোন কথা দেখতে পাই, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের মতের বিপরীত। তাহলে তা তার একান্ত ইজতেহাদ বা গবেষণা ধরে নেব। বিচ্ছিন্ন মতবাদ সর্বদা-ই বিচ্ছিন্ন, যার-ই হোক না কেন। এমন অবস্থায় আমাদেরকে কুরআন-সুন্নাহর উপর বা সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের অনুসরণ করতে হবে। আমরা আকাবিরদেরকে কুরআন-হাদিস দিয়ে যাচাই করে থাকি, তাদেরকে দিয়ে কুরআন-হাদিস যাচাই করি না। এ ক্ষেত্রে আমরা না বাড়াবাড়ি করি এবং না ছাড়াছাড়ি। কিন্তু বেরলভিরা ভাইয়েরা আকাবির দিয়ে কুরআন-হাদিস যাচাই করে! আর আহলে হাদিস ভাইয়েরা তো আকাবিরকে বিলকুল স্বীকার-ই করেন না! কিন্তু আমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করি।

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু একবার দরসে বলেন, যদি আমি কোন বিষয়ে তাফাররুদ গ্রহণ করি, তাহলে তা হবে আমার জন্য,

---

(১) জি হ্যাঁ ফিকহে হানাফি কুরআন ওয়া হাদিস কা নিচুড় হে, পৃ. ৮-১০, মুহাম্মাদ ইলিয়াস ঘুম্মান, মাকতাবায়ে শাইখুল ইসলাম দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত।

তোমাদের জন্য নয়। যতক্ষণ দারুল ইফতা আমার মত কবুল করবে না, তোমাদের জন্য এর ওপর আমল করা বৈধ নয়। তোমাদের জন্য প্রধান্য তা-ই, যা দারুল ইফতা বলে।

একটি দৃষ্টান্ত

এতদসত্ত্বেও আমাদের অনেকে বড়দের তাফাররুদকে আঁকড়ে ধরেন। এর একটি উদাহরণ হল রমজান মাসে তাহাজ্জুদের নামাজ জামাআতের সাথে আদায় করা। অথচ তা ছিল শাইখুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দ)-এর তাফাররুদাতের অন্তর্ভুক্ত। তার মতে তাহাজ্জুদের নামাজ জামাআতের সাথে পড়া জায়েজ। তিনি নিজেও পড়েছেন। তিনি এ বিষয়ে একটি ফতোয়াও লিখেছেন, যা *শাইখুল ইসলাম নম্বর* পৃ. ৫৪, *রুজুনামা আলজমিয়ত দিল্লি* এবং *মাকতুবাতে শাইখুল ইসলামে* রয়েছে।

ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ([১]) এর বিন্যস্তকারী মুফতি মাওলানা সালমান মনসুরপুরি দামাত বারাকাতুহুম টীকায় লিখেন: এই মাসআলা হজরতের তাফাররুদাতের অন্তর্ভুক্ত। তিনি গবেষণামূলক চিন্তাধারায় সরাসরি হাদিস থেকে এর বৈধতা উদঘাটন করেছেন। কিন্তু এর পক্ষে ফিকহে হানাফিতে কোন দলিল মিলেনি, বরং শামসুল আয়িম্মা সারাখসি রাহিমাহুল্লাহুর *আলমাবসুতে* (২/১৪২) এবং অন্যান্য হানাফি কিতাবে রয়েছে যে, তিন/চারজনের বেশি মুক্তাদি হলে নফল নামাজ জামাআতের সাথে আদায় করা মাকরুহ। এ মাসআলায় ফিকহে

([১]) ফেদায়ে মিল্লাত মাওলানা আসআদ মাদানি (মৃত্যু: ৭ মুহাররম ১৪২৭ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহুর নির্দেশে মাওলানা সালমান মনসুরপুরি দামাত বারাকাতুহুম 'মাকতুবাত' থেকে ফতোয়াগুলো বিন্যাস্ত করেছেন। সাথে টীকাও সংযুক্ত করেছেন। এর নাম দিয়েছেন 'ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম', যা মাকতাবায়ে দীনিয়া দেওবন্দ থেকে ১৯৯৭ সালে প্রথমবার প্রকাশ হয়।

হানাফির নিয়মনুযায়ী হজরত গাঙ্গুহি রাহিমাহুল্লাহুর মত শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য।(১)

আমাদের মতাদর্শের রূপকার মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন মাদানি রাহিমাহুল্লাহুর পির। তিনি *আর রাইয়ুন নাজিহ ফি আদাদি রাকআতিত তারাবিহ* নামক রিসালায় লিখেছেন: নফল নামাজ তাদায়ির সাথে হলে নাজায়েজ।(২)

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু লিখেছেন: রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা তাহাজ্জুদ একাই পড়তেন। কখনো ডাকাডাকি করে জামাআতের সাথে পড়েননি। হ্যাঁ, যদি কোন ব্যক্তি এসে শরিক হয়ে যায়, তাহলে সমস্যা নেই। যেমন: হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজেই একবার তার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু ডাকাডাকি করে জামাআতের সহিত আদায় করার ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন।(৩)

তিনি কি দীন বুঝেননি?

আমরা যখন বলি যে, তাহাজ্জুদের জামাআত তাদায়ির সাথে আদায় করা মাকরুহে তাহরিহিমি। তখন আমাদের কিছু ভাইয়েরা বলে থাকেন: আচ্ছা ভালো কথা! তাহলে কি তিনি দীন বুঝেননি? এর জবাব হল, অবশ্যই বুঝেছেন এবং ভালো করে বুঝেছেন। বুঝবেন না কেন? তিনি তো ছিলেন শাইখুল ইসলাম। তবে হাজার কথার একটি কথা ভুল হবে না এর কোন নিশ্চয়তা আছে? তারা তো আর নিষ্পাপ ছিলেন

---

(২) ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম, পৃ. ৪৫।

(২) আররাইয়ুন নাজিহ ফি আদাদি রাকআতিত তারাবিহ, পৃ. ১০, মাকতাবায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ।

(৪) ফাতাওয়া রশিদিয়া, পৃ. ৩০৭।

না। এক্ষেত্রে তারা ক্ষমার্হ সাব্যস্ত হবেন, ইনশাআল্লাহ। এজন্য তাদেরকে কোনরকম হেয়জ্ঞান করা যাবে না। এখন আমরা যদি ঐ প্রশ্ন-ই তাদেরকে করি, তাহলে তারা উত্তর দিবেন কী? এবার বলুন: শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহর পির, দেওবন্দিয়াতের মূল মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রাহিমাহুল্লাহ কি দীন বুঝেননি? فماهو جوابكم فهو جوابنا

দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া

এ বিষয়ে দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া রয়েছে, যাতে একে মাকরুহে তাহরিমি বলা হয়েছে। ফতোয়ার সারকথা হল যে, তিনজনের অধিক তথা ডাকাডাকির মাধ্যমে ইসতিসকা, তারাবিহ এবং কুসুফের নামাজ ব্যতীত বাকি সব ধরনের নফল নামাজের জামাআত মাকরুহে তাহরিমি। অতএব, জামাআতের সাথে তাহাজ্জুদ আদায় মাকরুহে তাহরিমি।(১) শাইখুল হাদিস জাকারিয়া কুদ্দিসা সিররুহু বলেন, আমাদের শাইখের (খলিল আহমাদ সাহারানপুরি রাহিমাহুল্লাহ) ওখানে তাহাজ্জুদের জামাআতে চারজনে বেশি অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল না।(২)

উসতাজে মুহতারাম হাফিজাহুল্লাহও একে হজরতের তাফাররুদ আখ্যায়িত করেছেন। তিনি আরো লিখেন: নফলসমূহে পাবন্দি নেই, যাতে করে মানুষ বেশি থেকে বেশি নফল পড়তে পারে। জামাআতের সাথে সালাত পড়াও এক ধরনের পাবন্দি, এই পাবন্দি কিন্তু নফলে

(১) বিস্তারিত জানতে দেখুন: মাওলানা মুফতি নুমান সিতাপুরি বিরচিত "ফাতাওয়া বরায়ে আমরিকা" প্রথম খণ্ড, মারাসিলা শুবায়ে ইন্টারনেট, নম্বর: ৩০২৬। আরো দেখুন: ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ, ৪/২২৩, জাকারিয়া দেওবন্দ, আহসানুল ফাতাওয়া, ৩/৪৬৮, মাকতাবায়ে থানভি দেওবন্দ, ফাতাওয়া রশিদিয়া, ২৫৪, বাকিয়াতে ফাতাওয়া রশিদিয়া, ১৮৩, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ৯/৩৭৮, ফাতাওয়া রহিমিয়া, ৪/১৩৬, থানভি লাইব্রেরি দেওবন্দ, কিতাবুল ফাতাওয়া, ২/২৮৫, খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানি, কুতুবখানা নাইমিয়া দেওবন্দ।

(২) আকাবির কা রমজান দ্রষ্টব্য।

নেই। জামাআতের সাথে নফল আদায় করা জায়েজ হলেও তা তাদায়ি না হওয়ার শর্তে। تداعي: باب تفاعل এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ: একজন অপরজনকে ডাকা। ফুকাহায়ে কেরাম তাদায়ির সংজ্ঞা এভাবে করেছেন যে, যদি ইমাম ব্যতীত তিনজন মুক্তাদি হয়ে যায়, তাহলে তাদায়ি হয়ে যায়। এক-দুইজন হলে হবে না। আর ডাকা এবং না ডাকার ওপর তা নির্ভর করে না। শাইখুল ইসলাম হজরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি সাহেব কুদ্দিসা সিররুহু তাদায়ির শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করতেন।

মোটকথা, নফলকে সব ধরনের পাবন্দি থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, যাতে করে মানুষের যখন-ই সুযোগ হয় নফল আদায় করতে পারে। জামাআতের শর্তারোপ করাও এক ধরনের পাবন্দি। এজন্য তাদায়ির অবস্থায় জামাআতকে মাকরুহ আখ্যায়িত করা হয়েছে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জামাআতে নফল আদায়ের যে সব ঘটনাবলী রয়েছে, তাতে দুয়ের অধিক মুক্তাদি ছিলেন না।(১)

তিনি আরো বলেন: তাহাজ্জুদের জামাআতের কোন শরয়ি প্রমাণ নেই। দলিল তো কুরআন-হাদিস এবং ফিকহ। চার ইমামের ফিকহ ভিন্ন ভিন্ন হলেও কুরআন-হাদিস তো তাদের যৌথ উৎসস্থল। আমাদের দলিল হচ্ছে, কুরআন, হাদিস এবং ফিকহে হানাফি।(২)

তাহাজ্জুদের জামাআত: তাকি উসমানির দৃষ্টিতে

১৯৫৯খ্রিষ্টাব্দ। মাহমুদ হাসান নামক এক ব্যক্তি পাকিস্তানের মুফতিয়ে আজম মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফি সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর বরাবর রমজানুল মোবারকে জামাআতের সাথে নফল নামাজ আদায়ের ব্যাপারে ইস্তিফতা পাঠায়। সাথে শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানি রাহিমাহুল্লাহুর ফতোয়ার একটি কপিও প্রেরণ করে। মুফতি

(১) তুহফাতুল কারি, ৩/৫০৪।

(২) ইলমি খুতবাত, ২/৮১, মাকতাবায়ে হিজাজ দেওবন্দ।

সাহেব রাহিমাহুল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ এই ফতোয়ার সমাধান সুযোগ্য সন্তান মাওলানা তাকি উসমানির সোপর্দ করেন। অথচ তিনি এখনো নিয়মতান্ত্রিক লেখাপড়া শেষ করেননি। সবেমাত্র মিশকাত জামাআত শেষ করেছেন। অতঃপর তিনি তার আল্লাহ-প্রদত্ত যোগ্যতা দ্বারা লিখে ফেললেন ছোট্ট একটি পুস্তিকা। ফলে পিতার ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন।(১)

তো তিনি সে পুস্তিকায় লিখেছেন: তারাবিহ ইসতিসকাহ এবং কুসুফ ব্যতীত ডাকাডাকির সহিত অন্যান্য নফলের জামাআত আদায় করা মাকরুহে তাহরিমি, রমজানে হোক বা রমজান ছাড়া হোক। এটা-ই সাধারণত ফকিহগণ এবং মুহাদ্দিসগণের মাজহাব, এরই ওপর সালাফে সালেহের ফাতোয়া ও অবিচ্ছেদ্য আমল চলে আসছে।(২)

তিনি নিবন্ধের শেষদিকে লিখেছেন: শেষ আর্জি হল যে, মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি রাহিমাহুল্লাহুর মহত্ত্ব, বড়ত্ব এবং ইলমি গভীরতার দিকে তাকালে কখনো কোন বড় আলেমের এই মাসআলায় কলম ধরার সাহস হতে পারে না, আমার মতো ছোট মানুষ তো দূরের কথা। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, উলামায়ে দেওবন্দের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের বুজুর্গদের শিক্ষা-দীক্ষা আমাদেরকে এমন সঠিক পথ দেখিয়েছে যে, শরিয়তের মাসআলার ব্যাপারে স্বাধীনভাবে মত-প্রকাশ করা শিষ্টাচার বহির্ভূত কিছু নয়, বরং ছাত্ররা নিজেদের মত-প্রকাশ করা আসাতিজাদের বাস্তবিক সাহচর্য্য। এজন্য আমার রিসার্চে যা প্রকাশ পেয়েছে, তা আল্লাহর নামে লিখে দিয়েছি। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, বড়দের শানে নূন্যতম বেয়াদবি থেকে! আল্লাহ তাআলা এ থেকে আমাকে হেফাজত করুন।(৩)

---

(১) ফিকহি মাকালাত, ২/ ৩৫-৫৬, জমজম বুক ডিপো দেওবন্দ।

(৩) বিস্তারিত দেখুন: ফিকহি মাকালাত, ২/৪১।

(১) ফিকহি মাকালাত, ২/৫৬।

মাওলানা মুফতি শাব্বির আহমাদ কাসেমি হাফিজাহুল্লাহ এ বিষয়ে লিখেন: সালাতে তারাবিহ, কুসুফ এবং ইসতিসকা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত নফল নামাজ জামাআতের সাথে পড়া সর্বাবস্থায় মাকরুহে তাহরিমি, রমজানে হোক বা অন্য সময়ে। যখন মুক্তাদি চারজন বার তারচে বেশি হবে। হজরত গাঙ্গুহি, হজরত থানভি, হজরত মুফতি আজিজুর রহমান সাহেব এবং হজরত মুফতি মাহমুদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ এরকম-ই বলেছেন।

তাতারখানিয়া, কাবিরি, আদ্দুররুল মুখতার এবং আলমগিরি ইত্যাদিতে একে সর্বসম্মতিক্রমে মাকরুহ বলা হয়েছে। মুক্তাদি তিনজন হলে কিছু উলামায়ে কেরামের মতে জায়েজ। দুজন হলে ঐক্যমতে জায়েজ। অতএব, রমজানে কোন হাফেজের পিছনে দুজন বা তিনজন মিলে কুরআন শোনা মাকরুহ হবে না।(১)

(২) ইজাহুল মাসায়িল, পৃ. ৫৯-৬০, মাওলানা শাব্বির আহমাদ কাসেমি, নাইমিয়া কুতুবখানা দেওবন্দ।

শাইখের ভুল হলে করণীয় কী

আমাদের অনেকের ধারণা যে, শাইখের ভুল ধরা যাবে না। এ কথা সঠিক নয়। বরং আদবের সাথে তাদেরও কোন কথার সমালোচনা করা যেতে পারে এবং করাও উচিত। কিন্তু ভ্রান্ত সুফিদের উক্তি হল, শাইখের কোন কাজ শরিয়া-বহির্ভূত দেখলেও ভুল ধরা যাবে না! তাদের এমন বিশ্বাস সঠিক নয়। ভুল তো ভুলই, যার-ই হোক না কেন। ভুল কথা মানতে আমরা বাধ্য নই।

তাজুদ্দিন আবদুল ওয়াহহাব বিন তাকি উদ্দিন সুবকি (মৃত্যু: ৭৭১ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ তার শাইখ শামসুদ্দিন জাহাবি (মৃত্যু: ৭৪৮ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে লিখেছেন: আমাদের শাইখ জাহাবি: জ্ঞান এবং আমানতের মধ্যে খ্যাত ছিলেন। এতদসত্ত্বেও আহলে সুন্নতের বিরুদ্ধে তার অধিক বাড়াবাড়ির ওপর ভরসা করা অনুচিত হবে। তিনি আমাদের শাইখ, আমাদের শিক্ষক। হকের অনুসরণ করা তো বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তার হিংসাত্মক মনোভাব এতোটাই চূড়ান্তে পৌঁছেছে, যা থেকে মানুষ লজ্জাবোধ করে! (১) কিন্তু অতি তিক্ত সত্য যে, অনেক লোক এটাকে হজরতের তাফাররুদও মানতে রাজি নয়! যেমনিভাবে বর্তমানে অনেক আলেমগণ খতমে তারাবির হাদিয়া নামক হারাম পয়সাকে হারাম মানতে-ই নারাজ।

বুজুর্গদের আমল কখন দলিল?

শরিয়তের দলিল তো কুরআন-হাদিস এবং তিন স্বর্ণযুগের আমল। এ সবের বিরুদ্ধে গিয়ে কোন বুজুর্গের আমল কখনো দলিল হতে পারে না।(২) আজ আমরা আকাবির আকাবির বলে তাদের নামে অনেক কিছু চালিয়ে দিচ্ছি। অথচ সেই আকাবিররা কেমন ছিলেন? মাত্র দুটি উদাহরণ দিচ্ছি:

---

(১) তাবাকাতুশ শাফিয়িয়াহ, ১/১৯০।

(২) এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: চেতনার মশাল, পৃ. ৬৭-৬৯ পর্যন্ত।

১- হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রাহিমাহুল্লাহ যখন হজরত থানভি রাহিমাহুল্লাহকে দিয়ে রিসালা *ফয়সালা হাফতে মাসআলা* লিখালেন।(১) বইটির একটি কপি তার-ই খলিফা হজরত রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রাহিমাহুল্লাহুর কাছে পৌঁছলে, তিনি একে স্পর্শ-ই করেননি, বরং ছাত্রদেরকে তা হাম্মামে ডুবিয়ে দিতে নির্দেশ দেন। আর বলেন: আমরা হাজি সাহেবের হাতে তরিকতের ওপর বাইআত করেছি, শরিয়তের ওপর বাইআত করিনি। এটাই বাস্তবতা যে, কিছু কিছু বুজুর্গানে দীন শেষ বয়সে কিছুটা বিদআতের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তখন তার সে আমল আর অনুসরণযোগ্য থাকে না। এজন্য যদি বুজুর্গদের আমল কুরআন-সুন্নাহ মোতাবিক হয়, তাহলে তা আমলযোগ্য এবং গুরুত্বারোপের যোগ্য, অন্যথায় নয়।(২)

২- শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আমার একশোর কাছাকাছি (হাদিসের) শাইখ রয়েছেন, যাদের থেকে আমি ইলম অর্জন করেছি এবং উপকৃত হয়েছি। তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বিশ্বাস এবং চিন্তাধারা রয়েছে। কিন্তু আমি তাদের কারো কথা উসতাজ এবং শাইখ হিসেবে মানা জরুরি মনে করিনি, বরং তাদের থেকে তা-ই গ্রহণ করেছি, যা সঠিক, বিশুদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্য মনে করেছি। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য তালেবে ইলমের ন্যায় কখনো ভুল করেছি। আবার কখনো বিশুদ্ধতায় পৌঁছেছি।(৩)

---

(১) এতে মিলাদসহ মতভেদপূর্ণ ৭টি মাসআলা রয়েছে। প্রথমদিকে থানভিও মিলাদের প্রবক্তা ছিলেন। অবশ্য তিনি পরে এ থেকে রুজু করেছেন। ইতিপূর্বে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বইটি সম্পর্কে জানতে আরো দেখুন: তাজাল্লিয়াতে সফদার, ১/৪৫৪, আমিন সফদার উকাড়ভি রাহিমাহুল্লাহ, আশরাফুস সাওয়ানিহ, ৩/৩৫০, খাজা আজিজুল হাসান। আরো পড়ুন: আহসানুল ফাতাওয়া।

(২) তুহফাতুল আলমায়ি, ৩/৪৬২।

(৩) কালিমাতুন ফি কাশফি আবাতিল ওয়া ইফতিরাআত, পৃ. ৩৮।

আল্লাহর প্রকৃত বান্দারা কারো কথা বাছবিচার করে-ই গ্রহণ করে থাকেন। পবিত্র কুরআনে কারিমে রহমানের বান্দাদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে: আর যাদেরকে তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ বুঝানো হলে তাতে অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না।(১) অর্থাৎ তারা কোন কথা শুনলে তাহকিক ব্যতিরেকে অন্ধভাবে আমল করতে শুরু করে না।

(১) সুরা ফুরকান: ৭৩।

পরিশিষ্ট-২

প্রচলিত খতমে বুখারি: কিছু কথা

দেওবন্দিয়াত শরিয়তের অনুকরণ এবং সুন্নাহর থেকে ভিন্ন কোন বস্তু নয়। এজন্য দেওবন্দি মতাদর্শে বিদআত এবং কু-সংস্কারের কোন সুযোগ নেই। কিন্তু বর্তমানে মাদারিসে আরাবিয়ায় খতমে বুখারির নামে ভিন্নরকম অনুষ্ঠান মাত্রাতিরিক্ত হচ্ছে এবং তা দিন দিন বেড়ে-ই চলছে! এর সাথে একে একে যোগ হচ্ছে নানা কুসংস্কার, যা বলার প্রয়াস রাখি না! এই নিয়ম দারুল উলুম দেওবন্দেও এক সময় ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

একদিন বাদ আসর উসতাজে মুহতারাম কুদ্দিসা সিররুহুর কাছে প্রচলিত খতমে বুখারি সম্পর্কে একজন ছাত্র জানতে চাইলে তিনি উত্তরে বলেন: তা বিদআত! দারুল উলুম দেওবন্দেও এক সময় তা ছিল, পরে কর্তৃপক্ষ তা বন্ধ করে দিয়েছে। সুতরাং তোমরাও যদি বাস্তবিক অর্থে দেওবন্দি হয়ে থাক, তাহলে দারুল উলুম দেওবন্দকে মেনে চল। মিশরেও (১) এমন প্রথা ছিল, পরে শাইখ জামালুদ্দিন কাসেমি (১৩৩২ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ (২) একে বন্ধ করে দিয়েছেন।

দেওবন্দে নীরব এক খতমে বুখারি!

বার্ষিক পরীক্ষার আর মাত্র একদিন বাকি। উসতাজে মুহতারাম মুফতি সাইদ আহমাদ পালনপুরি কুদ্দিসা সিররুহু প্রতি দিনের মতো আজও এশার পর দরসে আসেন। আমাদের সকলের ধারণা ছিল যে, প্রতি দিনের মতো আজও এক ঘণ্টা দরস দিয়ে চলে যাবেন এবং পরের দিন দুপুরে শেষ দরস প্রদান করবেন। কিন্তু সকলের ধারণা অসত্যে পরিণত হয়! সবক বিরামহীন চলছে-ই। যখন ঘড়ির কাটা

---

(১) সম্ভবত সিরিয়া হবে।

(২) দাদার দিকে সম্বন্ধ করে তাকে কাসেমি বলা হয়। কাওয়ায়িদুত তাহদিস মিন ফুনুনি মুসতালাহিল হাদিস, পৃ. ২৪ এ তার জীবনী রয়েছে।

রাত বারোটায়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, আজ শেষ করে-ই ছাড়বেন। অবশেষে তা-ই হল। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল যে, এতে না ছিল কোন ধরনের পূর্ব ঘোষনা এবং না ছিল শেষ হাদিসে আজব ধরনের তাকরির ও ফাজায়েল! ছাত্রদের তরফে দুআর আবেদন করলে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু ছাত্রদের তরফে শতাধিক দুআর আবেনপত্র দেখে সংক্ষিপ্ত দুআ করে দরসগাহ প্রস্থান করেন।

খতমে বুখারিঃ দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া

দারুল উলুম দেওবন্দর ফতোয়া বিভাগের তরফে একটি ফতোয়া জারি করা হয়, যাতে এমন রীতিনীতি পরিহার করতে সবাইকে আহবান করা হয়েছে। ফতোয়াটি নিম্নোক্তঃ

বর্তমানে অধিকাংশ মাদরাসায় বুখারি শরিফের শেষ হাদিসের দরস অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ হয় এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে তারিখ নির্ধারণ করে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে চতুর্দিকের মানুষকে একত্রিত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। এতে অনেক নারীরাও উপস্থিত হয়। এ রকম না হওয়া উচিত। দারুল উলুম দেওবন্দেও আগে খতমে বুখারি উপলক্ষে দিগ-দিগন্তের অনেক মানুষ (নারীসহ) ছুটে আসত। অনেক মানুষের উপস্থিতিতে বুখারি শরিফের আখেরি দরস দেয়া হত। পরবর্তী সময়ে আকাবিরে দেওবন্দ এর উপর পাবন্দি আরোপ করেছেন। বর্তমানে দারুল উলুম দেওবন্দে তারিখ নির্ধারণ ব্যতিরেকে বিলকুল নিরবতার সাথে *সহিহ বুখারির* শেষ সবক দেয়া হয়। অন্যান্য মাদরাসাগুলোকেও এর অনুকরণ করা উচিত।(১)

খতমে বুখারিঃ আধুনিক মূর্খতা!

গেল বছর সহিহ বুখারির *বাবুল জাহিলিয়া* অধ্যায় পাঠদানকালে হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু ছাত্রদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ জাহিলিয়াতের যুগ দুটি। একটি হচ্ছে দূরবর্তী জাহিলিয়াত। আর সেটা

---

(১) মারাসিলা শুবায়ে ইন্টারনেট, নম্বরঃ ৫৩৬৭।

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের অনেক আগের জাহিলিয়াত। আরেকটা হচ্ছে, নিকটতম যুগের মূর্খতা। আর সেটি রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু আগের জাহিলিয়াত। আর এই নিকটতম জাহিলিয়াতের কিছু বস্তু এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। এর বাস্তব একটি উদাহরণ হচ্ছে, বর্তমান যুগের জাঁকজমকপূর্ণ খতমে বুখারির অনুষ্ঠানের প্রথা।

প্রথাসমূহ প্রথমদিকে বৈধতার আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলেও পরবর্তীতে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। দারুল উলুম দেওবন্দে খতমে বুখারির প্রথা শুরু হয়েছিল শাইখুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি কুদ্দিসা সিররুহুর শেষ যুগে। প্রথমদিকে খতমে বুখারির অনুষ্ঠানে বেশি লোকের সমাগম হত না। শুধু বড় বড় উলামায়ে কেরাম নসিহত পেশ করতেন এবং সহিহ বুখারির শেষ দরসের মাধ্যমে সমাপ্ত করা হত। কয়েক বছর পর থেকে লোক সমাগমও বৃদ্ধি পেতে লাগল। অবস্থা এই দাঁড়াল যে, মহিলারাও বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসতে শুরু করল, বেপর্দা নারীরা পুরুষের সাথে দুআ নেয়ার জন্য আসতে লাগল। এ দিকে কর্তৃপক্ষ তাদের জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থাও করেনি। ফলে মহিলারা বাচ্চাদের পেশাব-পায়খানা মাদরাসার মাঠে-ই সারাতে লাগল! পরিস্থিতি এমন নাজুক হয়ে দাঁড়ায় যে, এক দিন খতমে বুখারির অনুষ্ঠান হত এবং পরের তিন দিন পর্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নাতার জন্য বন্ধ রাখতে হত।

তখন মুহতামিম ছিলেন মাওলানা মারগুবুর রহমান বিজনুরি রাহিমাহুল্লাহ। আমি তাকে বললাম, হজরত! এ সব কী হচ্ছে!? এগুলো গড়াচ্ছে কোন দিকে? আমার বারবার বলার পর এক সময় তার অন্তর প্রশস্ত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি এ রকম খতমে বুখারির অনুষ্ঠান হবে না বলে ঘোষণা দেন এবং যার যার নেসাব শেষ করে অন্যান্য কিতাবের মতো সমাপ্ত করতে উভয় শাইখুল হাদিসকে বার্তা পাঠান। সেই থেকে এই প্রথা দারুল উলুমে বন্ধ রয়েছে।

কিন্তু এই প্রথা হিন্দুস্তান, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে এখনো রয়ে গেছে এবং তা জাঁকজমকতার সাথে-ই অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা কোনভাবে-ই গ্রহণযোগ্য নয়। তাজ্জবের বিষয় হচ্ছে যে, যে শাইখ সারা বছর পুরা বুখারির দরস দিতে পারেন, তিনি শেষ হাদিসটি পড়াতে পারেন না? শেষ হাদিস পড়ানোর জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করা লাগে? এটা কোন তামাশা! পুরা বুখারি শরিফ পড়াতে পারলে শেষ হাদিস পড়াতে সমস্যা কোথায়?

হ্যাঁ, আড়ম্বনাপূর্ণ আয়োজন না করে এবং একে প্রথা না বানিয়ে স্বাভাবিকভাবে সমাপ্ত করে দেয়া উচিত। তবে ছাত্রদের উপকারার্থে এতে বড়দেরকে আমন্ত্রণ করা যেতে পারে। ছোট মাদরাসাগুলোকে তো বড় বড় মাদরাসার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হয়। এজন্য বড় আলেমদেরকে দাওয়াত দেয়া দরকার। তখন এক দুইজন সাধারণ মানুষ চলে আসলে তাদেরকে বসার সুযোগ দেয়া ভিন্ন কথা।

কিন্তু রসম বানিয়ে আড়ম্বনার সাথে অনুষ্ঠান করা অগ্রহণীয়। কারণ মানুষ একে ধীরে ধীরে আলাদা এবাদত মনে করতে লাগবে। এজন্য অবশ্য-ই এগুলো পরিহারযোগ্য। ([১])

২৬মার্চ ২০১৯

([১]) শ্রুতিলিখন: হুমায়দি হুসাইন।

খতমে বুখারি: বাড়াবাড়ির লাগাম টেনে ধরুন

মুফতি আবুল কাসেম নুমানি হাফিজাহুল্লাহ

চট্টলার নজিরহাট বড় মাদরাসার বুখারি শরিফের সমাপনী দরসে দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম, হজরতুল উসতাজ মাওলানা আবুল কাসেম নুমানি সাহেব জিদা মাজদুহু তার বয়ানে বলেছেন: আপনারা উম্মতের জন্য অনুসরণীয়। অতএব, আপনাদের প্রতিটি কদম হতে হবে খুবই সতর্কতার সাথে। আপনাদের পদস্খলন মানে জাতির পদস্খলন। এই যে বুখারি শরিফের খতম, কোথাও এর নজির নেই! দারুল উলুম দেওবন্দেও বুখারি শরিফ খতম হয়। কিন্তু কেউ জানে-ই না! কোন উসতাজ বা অন্য ক্লাসের ছাত্ররাও পর্যন্ত জানতে পারেন না। এমনকি মুহতামিম সাহেবও জানেন না! দাওরায়ে হাদিসের ছাত্ররাও বুঝতে পারে না যে, কখন সমাপ্ত হবে? আচমকা একদিন উসতাজ বলবেন, আজ শেষ করে দেব! ব্যস সে দিন-ই দুআর মাধ্যমে শেষ করা হয়।

কিন্তু বাংলাদেশে এ নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তা যে কৈফিয়তে হচ্ছে, তা বিদআত পর্যায়ে চলে যাচ্ছে! অতএব, আপনারা সম্মিলিতভাবে এর লাগাম টেনে ধরুন এবং আস্তে আস্তে তা বন্ধ করে দিন।

দারুল উলুম দেওবন্দ স্রেফ একটি মাদরাসা নয় যে, সেখানে যারা পড়া-শোনা করবেন এবং শিক্ষকতা করবেন শুধু তারা-ই দেওবিন্দ। বরং দারুল উলুম দেওবন্দ হচ্ছে, একটি চেতনার নাম, যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সমস্ত আকিদা লালন করে থাকে। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের অধিবাসী: লণ্ডন, আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া বা অন্য দেশের। যদি সে এই আকিদা লালন করে, তাহলে

সেও দেওবন্দি। সে দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্র/শিক্ষক হোক বা না হোক।([১])

এছাড়াও হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু পরের দিন (২৫ মার্চ) জামেআ পটিয়ায় একটি অনুষ্ঠানে এই ধরনের আয়োজন থেকে বিরত থাকতে মাদরাসার দায়িত্বশীলদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন: জামেআ পটিয়া বাংলাদেশের কওমি মাদরাসাগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে এর কথার অবশ্যই মূল্য আছে। সুতরাং আমি এই মারকাজ থেকে বাংলাদেশের সমস্ত মাদরাসার দায়িত্বশীলদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি যে, দয়া করে ভবিষ্যতে বিদআতের শঙ্কাযুক্ত এ সব অনুষ্ঠান থেকে আপনারা নিজেদেরকে বিরত রাখুন।

এখানে শেষ নয়, হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু (২৫মার্চ) নরসিংদির মেরাজুল উলুম মাদরাসায় বিদায়ী পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে বলেছেন: যারা দারুল উলুম দেওবন্দকে উম্মুল মাদারেস মানেন, তারা যেন খতমে বুখারির অনুষ্ঠান পরিহার করেন।

খতমে বুখারি: দেওবন্দিয়াতের খেলাপ

শাইখুল ইসলাম তাকি উসমানি জিদা মাজদুহুম

শাইখুল ইসলাম মাওলানা তাকি উসমানি জিদা মাজদুহুম গত বছর দারুল উলুম করাচিতে *সহিহ বুখারির* সমাপনী দরসে বলেন: বর্তমানে দীনি মাদারিসে খতমে বুখারির অনুষ্ঠান জৌলুসে পরিণত হয়েছে। অথচ এটা দেওবন্দিয়াতের খেলাপ। আমাদের আকাবিরদের সময়ে এ সবের কোন অস্তিত্ব ছিল না। হজরত মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি এবং হজরত আনোয়ার শাহ কাশমিরিসহ কারো থেকে

([১]) হাটহাজারি সমাচার: ২৪মার্চ ২০১৯।

এমন আয়োজন প্রমাণিত নেই। আমাদের আব্বাজান রাহিমাহুল্লাহুর আমলেও আমরা তা দেখিনি। পরবর্তী সময়ে তা ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়েছে! সুতরাং আমাদের আকাবিরগণ যা করেননি, তা আমাদেরকে পরিত্যাগ করা উচিত। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝার তওফিক দান করুন।([১])

([১]) মাওলানা উমর ফারুক ইবরাহিমির সূত্রে।

পরিশিষ্ট-৩

তওহিদ ও উলামায়ে দেওবন্দ

তওহিদ তথা একত্ববাদের বিপরীত শব্দ হচ্ছে, শিরিক। ইসলামে শিরিক হল, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে উপাস্য হিসেবে সাব্যস্ত করা বা তার উপাসনা করা। সাধারণত বিভিন্ন মূর্তি, পাথর, গাছ, নক্ষত্র, ফেরেশতা, জিন এবং মৃত ব্যক্তি ইত্যাদি বস্তু এবং জীবের এবাদত বা উপাসনা করা হয়। এ সব উপাস্যকে ভয়-ভীতি এবং আশা-আকাঙ্খার সাথে ডাকা, বিপদে তাদের কাছে সাহায্য তলব করা, তাদের কাছে আশ্রয় এবং উদ্ধার প্রার্থনা করা, তাদের নামে জবাই করা এবং মানত করা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড নিঃসন্দেহ শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

মানবজাতিকে এই তওহিদের দাওয়াত দিতে এবং শিরিক-কুফরি থেকে ভীতি-প্রদর্শন করতে এ ধরায় আগমন করেছেন অসংখ্য নবি-রসুল। তাদের সংখ্যা কমবেশি একলক্ষ চব্বিশ হাজার।(১) যেহেতু এখন আর কোন নবির আগমন ঘটবে না। এজন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডবল প্রেরণ করেছেন। (২) অর্থাৎ তার উম্মতও প্রেরিত। তিনি সরাসরি সাহাবায়ে

---

(১) দেখুন: মুসনাদে আহমাদ, ৩৬/৬১৯, হাদিস: ২২২৮৮, তাহকিক-তালিক: শুআইব আরনাউত হানাফি রাহিমাহুল্লাহ, মুআসসিসাতুর রিসালা দিমাশক।

উল্লেখ্য, হাদিসটি জয়িফ। আর আকিদার ক্ষেত্রে জয়িফ হাদিস গ্রহণীয় নয়। তাই সীমাবদ্ধ না করে কমবেশি বলা উচিত। আর দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর সম্পর্কে কোন রেওয়ায়েত-ই খুঁজে পাওয়া যায় না। হাফেজ জালালুদ্দিন সুয়ুতি (মৃত্যু ৯১১ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ তাখরিজু আহাদিসি শরহিল আকায়িদ এ বলেন: আমি একে- দুই লক্ষ চব্বিশ হাজারের রেওয়ায়েত- খুঁজে পাইনি। মোল্লা আলি কারি হানাফি (মৃত্যু ১০১৪ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ ফারায়িদুল কালায়েদ আলা আহাদিসি শরহিল আকায়িদ, ক্রমিক নম্বর: ৩৬ এ তার কথার মৌন সমর্থন করেছেন। এসব হাদিস নয়, ২/৩৫ থেকে।

(২) এ বিষয়ে দেখুন: রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ, ২/৫০-৫৬।

কেরাম তথা আরববাসীর প্রতি প্রেরিত এবং সাহাবায়ে কেরামগণ বিশ্ববাসীর প্রতি দাওয়াতি কাজের জন্য আদিষ্টিত।

এ হিসেবে দেওবন্দি মিশনের উলামায়ে কেরামগণও উপমহাদেশের প্রতি দাওয়াতি কাজের জন্য প্রেরিত। আল্লাহ তাআলা উলামায়ে দেওবন্দকে উত্তম বদলা দান করুন, যারা নবিওয়ালা কাজ তওহিদের প্রচার-প্রসারে নিজেদের জীবনকে বিসর্জন করে দিয়েছেন। তওহিদ প্রতিষ্ঠায় নিজেদেরকে বিলীন করে দিয়েছেন। শিরিক-বিদআতের চারণভূমি হিন্দুস্তানের মানুষদের একত্ববাদের দিকে ফিরিয়ে আনতে তারা আপ্রাণ সাধনা করেছেন। বহু কিতাবও রচনা করেছেন।(১) তা কার্যকরী সফলতাও বয়ে এনেছে। তারা শিরিক, বিদআত, কুসংস্কারসহ হিন্দুয়ানি রীতিনীতির দুই-তৃতীয়াংশ মিটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু আজ আবার তা সেই শিরিক-বিদআতে আচ্ছাদিত হতে চলছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ও বেদানাদায়ক! একে হালকা নজরে দেখার কোন সুযোগ নেই।

বিদআতি বেরলভিদের ব্যাপারে মাওলানা মনজুর নুমানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: এই দলটি ক্ষতির দিক থেকে কাদিয়ানিদের থেকেও ভয়ঙ্কর। এদের থেকে উম্মতের হেফাজতের জন্য জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি নিত্যনতুন কর্মকৌশল রপ্ত করাও অবশ্যক।(২)

বিদআতের মোকাবেলায় উলামায়ে দেওবন্দ

বাস্তবতা এই যে, যখন ইসলাম হিন্দুস্তানে পৌঁছেছে, তখন সেখানকার প্রাচীন রীতি-নীতি তাহজিব-তামাদ্দুন, রীতি-নীতি, মেজাজ, ধর্মীয় শিক্ষা এবং ধর্মীয় রীতি-নীতিতে বিরাট প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু এর সাথে এ কথাও অনস্বীকার্য বাস্তবতা যে, হিন্দুয়ানি রীতি-নীতির

---

(১) শিরিক-বিদআতের বিরুদ্ধে তাদের লিখিত বইয়ের নাম জানতে দেখুন: দারুল উলুম দেওবন্দ কি জামে ওয়া মুখতাসার তারিখ, পৃ. ২৯৬।

(২) বরণ্যদের স্মৃতিচারণ, তাকি উসমানি, পৃ. ৪৫০।

অনুপ্রবেশ মুসলিম-সমাজে কম ঘটেনি। তা মুসলিম-সমাজে এমনভাবে চেপে বসেছে, আজ এ কথার অনুধাবন পর্যন্তও মুছে গেছে যে, এই রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন ইসলামি সমাজের মধ্যে অমুসলিমদের থেকে প্রবেশ করেছে। হিন্দুস্তানি মুসলমানদের মধ্যে অনেক বিদআত, রীতি-নীতি, কবরপূজা, মেলা কাওয়ালি, মাজারে অবাধে নারী-পুরুষের মিলা-মেশা, মাজারে মানত করা, বিবাহ শাদিতে নানান রীতিনীতি এবং হিন্দুয়ানি রীতি-নীতি মুসলিম-সমাজে তাদের থেকে-ই এসেছে। মুসলমানদের এই দূরাবস্থার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি রাহিমাহুল্লাহ আওয়াজ উঁচু করেছেন। তারপর হজরত মাওলানা সায়্যিদ আহমাদ শহিদ রায়বেরেলি, হজরত মাওলানা ইসমাইল শহিদ এবং মাওলানা আবদুল হাই সারসুতি রাহিমাহুল্লাহ। তারা বীরত্বের সাথে মুসলমানদের আকিদা এবং আমল সংশোধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই শুদ্ধি আন্দোলন ১৮৩১ সালে হজরত সায়্যিদ আহমাদ শহিদ এবং তার সাথীদের শাহাদতের পরে স্থিমিত হয়ে যায়।

অতঃপর ওয়ালিউল্লাহি চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে উলামায়ে দেওবন্দ সংশোধনের এই কর্মপন্থা চালু করেছেন এবং তা সামনে আগানোর জন্য নিজেদের সর্বোচ্চ চেষ্টা-সাধনা ব্যায় করেছেন। এই মিশনের নেতৃত্বে ছিলেন হজরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতভি রাহিমাহুল্লাহ এবং মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রাহিমাহুল্লাহ।(১)

তওহিদ: নজদি চেতনা!

তওহিদের ক্ষেত্রে আমাদেরকে ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নজদি রাহিমাহুল্লাহর চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ফের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। অন্যথায় আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার! দেশ শিরিক এবং বিদআতের ভয়াল থাবায় আচ্ছাদিত হতে চলছে!

---

(১) বিস্তারিত জানতে দেখুন: দারুল উলুম দেওবন্দ কি জামে ওয়া মুখতাসার তারিখ, পৃ. ২৯০-২৯৯।

উলামায়ে কেরাম আমলের ফজিলত নিয়ে কথা বললেও ইমান, আকিদা, শিরিক এবং বিদআত নিয়ে মুখ খুলতে তেমন একটা নজরে আসে না। এমতাবস্থায় আমাদেরকে হাল ধরতে হবে। ঘুরে দাঁড়াতে হবে সোনালি অতীতের দিকে। যেমনিভাবে ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে, এই উম্মতের শেষ যুগের লোক শুদ্ধি হবে না। কিন্তু প্রথম যুগের মানুষ যার মাধ্যমে শুদ্ধি লাভ করেছে অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা।

ঘুণে ধরা সমাজকে কুরআন-হাদিসের দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এজন্য এ বিষয়ে আমাদেরকে আরো সোচ্চার হওয়া অত্যন্ত জরুরি। পরস্পর হিংসা-দ্বেষ, গালাগালি এবং সব ধরনের উগ্র-মনোভাব পরিহার করে পেয়ার, মহব্বত, ভালোবাসা এবং দরদি কণ্ঠে দাওয়া ইলাল্লাহর নিয়তে মানুষকে বুঝাতে হবে।

চেতানায়ে নজদিঃ আমাদের মিল-অমিল

অনেকের ধারণা যে, ইমামুদ দাওয়াহ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নজদি রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন একজন ভ্রষ্ট লোক! নাউজুবিল্লাহ! এমন ধারণা সঠিক নয়। হ্যাঁ, তার মেজাজে একটু কঠোরতা ছিল। তবে তিনি ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত। তার কোন আকিদা-বিশ্বাস এর বাইরে নেই। উলামায়ে দেওবন্দ প্রথমদিকে অনবগতির কারণে তাকে ভ্রষ্ট বলে ফতোয়া দিলেও পরে বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত হলে অকপটে রুজু করে ফেলেন। অতঃপর তারা তার কর্মের ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন। কারণ শিরিক এবং বিদআতের নির্মূলে উলামায়ে নজদ এবং উলামায়ে দেওবন্দ এক ও অভিন্ন।

একটি ভ্রান্তির নিরসন!

সঠিক তথ্যের অনবগতির কারণে আল্লামা ইবনে আবেদিন শামি (১২৫২ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ তাকে খাওয়ারিজদের মধ্যে গণ্য

করেছেন!([১]) এর মূল কারণ হল, কারো সম্পর্কে শোনা এবং কারো রচনাবলী পড়ে তার সম্পর্কে জানা এক জিনিস নয়। কারো সম্পর্কে শোনা কথা বাস্তবতায় সত্য হবে-ই এমনও নয়। বিরোধীদের প্রোপাগাণ্ডায় প্রভাবিত হয়ে আল্লামা ইবনে আবেদিন শামি রাহিমাহুল্লাহ তাকে এবং তার অনুসারীদেরকে খাওয়ারিজ আখ্যা দিয়েছেন। কারণ প্রথমদিকে বিরোধিদের থেকে তার সম্পর্কে শুধু শুনেছেন। কারণ তার রচিত কোন বই-পুস্তক তার হাতে পৌঁছেনি।

উলামায়ে দেওবন্দের রুজু

প্রথমদিকে উলামায়ে দেওবন্দও তাকে ভ্রষ্ট বলে ফতোয়া দিয়েছেন। কেননা তার কোন বই তাদের হাতে পৌঁছেনি। কান-কথার ওপর ভিত্তি করে তারা এমনটা করেছিলেন। তখনকার সময়ে হজের উদ্দেশ্যে নানা দেশের হাজিরা হিজাজে একত্রিত হত। তাই ঐ সময় হিজাজে তাদের বিরুদ্ধে মৌখিকভাবে বা লিখিতকারে যা কিছু প্রসিদ্ধ ও প্রচারিত ছিল, তা হাজিদের মাধ্যমে গোটা বিশ্বে ছড়ানো হত! এ সবের সাথে প্রত্যেক অঞ্চলের মাজারি এবং ভিত্তিহীন রসম-রেওয়াজের অনুসারীদের তরফ থেকে নানা টিকা-টিপ্পনীও যোগ হতে থাকে।

কিন্তু যখন কিছু দিন পর তার লেখা বইসমূহ তাদের কাছে পৌঁছল, তখন তারা অকপটে পূর্বের ফতোয়া থেকে রুজু করে ফেলেন। তার বইসমূহ হাতে আসলে দেখা যায়, তার কোন আকিদা-ই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বাইরে নয়। মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি, মাওলানা আশরাফ আলি থানভিসহ আমাদের অনেক আকাবির প্রথমদিকে তার ব্যাপারে চুপ ছিলেন। আবার কেউ কেউ তাকে ভ্রষ্ট বলে ফতোয়া প্রদান দিয়েছিলেন। পরে বাস্তবতা প্রকাশিত হলে তারা রুজু করে নেন।(২)

([১]) দেখুন: রদ্দুল মুহতার আলাদ্দুররিল মুখতার, ৬/৪০০, জাকারিয়া দেওবন্দ।

(২) অংশবিশেষ মাসিক আলকাউসার থেকে।

দেওবন্দিয়াতের রূপকার মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি (মৃত্যু ১৩২৩ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ দীর্ঘদিন পর্যন্ত শাইখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ এবং তার আন্দোলনের বিষয়ে অনবগত ছিলেন। এজন্য *ফাতাওয়া রশিদিয়াতে* প্রথমদিকে একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি লিখেছেন যে, মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাবের আকিদার ব্যাপারে আমার জানা নেই।(১) কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্রে তার কিছু অবস্থা জানা হলে আরেক প্রশ্নকারীর জবাবে তিনি বলেছেন যে, মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাবকে মানুষ ওহাবি বলে। তিনি ছিলেন ভালো একজন মানুষ। তিনি হামবলি মাজহাবের অনুসারী এবং হাদিসের ওপর আমলকারী ছিলেন বলে শুনেছি। তিনি বিদআত এবং শিরিক থেকে মানুষকে বারণ করতেন। এতদসত্ত্বেও তার মেজাজে ছিল কঠোরতা।(২)

আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নজদির অনুসারীদেরকে ওয়াহাবি বলা হয়। তাদের আকিদা ভালো ছিল। তারা হামবলি মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। তাদের স্বভাবে কিছুটা কঠোরতা ছিল। তিনি এবং তার অনুসারীগণ ভালো ছিলেন। তবে তাদের সীমালঙ্ঘনকারীদের ভিতরে ফসাদ এসে গিয়েছিল।(৩)

এমনিভাবে হজরত মাওলানা খলিল আহমাদ সাহারানপুরি (মৃত্যু: ১৩৪৬ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ যখন এই আন্দোলন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা রাখতেন না, তখন *রদ্দুল মুহতার* কিতাবের তথ্যের ভিত্তিতে *আততাসদিকাতে* শাইখকে এবং তার সমমনা লোকদেরকে (নাউজুবিল্লাহ!) খারেজি লিখেছেন।(৪) কিন্তু পরে যখন ১৩৪৪

---

(২) ফাতাওয়া রশিদিয়া, পৃ. ৬২।

(২) ফাতাওয়া রশিদিয়া, পৃ. ২৪১, তালিফাতে রশিদিয়ার সাথে মুদ্রিত, মাকতাবাতু হক বোম্বে।

(৩) ফাতাওয়া রশিদিয়া, পৃ. ২৪২।

(৪) দেখুন: আলমুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ, পৃ. ২২৮-২৩০।

হিজরিতে তিনি হিজরত করে হিজাজে চলে যান এবং নজদিদেরকে কাছ থেকে দেখার তার সুযোগ হয়, তখন তাদের ব্যাপারে তার ধারণার পরিবর্তন ঘটে, যা তিনি তার একাধিক চিঠিতে উল্লেখ করেছেন।

ওয়াহাবি পরিভাষাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি তার কিতাব *আততাসদিকাতে* লিখেছেন: যেহেতু আমাদের উলামা-মাশায়েখগণ সুন্নতের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় এবং বিদআতের আগুন নির্বাপিত করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকায় *শয়তানের দল* তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ ছিল। এরা তাদের কথা-বার্তায় বিকৃতি ঘটিয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে। আর তাদেরকে ওয়াহাবি নামে আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু আল্লাহর পানাহ তারা কখনো-ই এমন নন।(১)

হজরত মাদানি রাহিমাহুল্লাহ যেহেতু **১৩১৬** হিজরি থেকে **১৩৩৩** হিজরি পর্যন্ত মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করেছেন। যে সময় সেখানে নজদিদেরকে খুব খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হত এবং তাদের সম্পর্কে এমন সব গুজব প্রচলিত ছিল, যা তাদের সম্পর্কে খুব খারাপ ধারণা সৃষ্টি করত। হজরত মাদানি রাহিমাহুল্লাহ যেহেতু সরাসরি আন্দোলনটি অধ্যয়ণ করেননি, তাই তিনি সেখানের সাধারণ আবহাওয়ায় প্রভাবিত ছিলেন এবং *আশশিহাবুস সাকিব গ্রন্থে ঐ* সময়ের তথ্যের ভিত্তিতে নজদিদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু লিখেছেন। পরে এই আন্দোলন ও দাওয়াতকে সরাসরি অধ্যয়ণ করলে তার ধারণায় পরিবর্তন আসে এবং তিনি তার পূর্বের মত পরিহার করেন। **১৭** মে **১৯২৫** খ্রিষ্টাব্দে একটি পত্রিকায় তিনি এই ঘোষণা দেন যে, এ ঘোষণা দিতে আমার কিছু মাত্র দ্বিধা নেই যে, আমি আহলে নজদের বিরুদ্ধে *রুজুমুল মাদানিয়্যিনে* এবং *আশশিহাবুস সাকিবে* যা কিছু লিখেছিলাম, তা তাদের রচনাবলীর ভিত্তিতে ছিল না, বরং শুধু জনশ্রুতির বা তাদের বিরোধীদের বক্তব্যের ভিত্তিতে ছিল। এখন তাদের নির্ভরযোগ্য রচনাবলী বলছে যে, তাদের

---

(১) পৃ. ২১৫-২১৬, আলকাউসার: অক্টোবর ২০১৬ এর সূত্রে।

বিরোধিতা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সাথে ততটা নয়, যতটা প্রচার করা হয়েছে। বরং কিছু শাখাগত বিষয়ে এ পর্যায়ের মত-পার্থক্য রয়েছে, যার ভিত্তিতে তাদেরকে ফাসেক বা গোমরা বলা যায় না।(১)

শিরিক এবং বিদআত নির্মূলে আমরা অভিন্ন

ইমামুদ দাওয়াহ শাইখ নজদি রাহিমাহুল্লাহুর আন্দোলনটি ছিল মূলত তওহিদের প্রচার, সুন্নতের প্রতিষ্ঠা এবং শিরিক-বিদআতের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে। তবে কিছু শাখাগত বিষয়ে অন্যান্য আহলে ইলমের সাথে তার মতানৈক্য ছিল। অন্য দিকে তার আন্দোলনে নতুন যোগদানকারী কিছু লোকের মাধ্যমে কিছু বাড়াবাড়িও হয়েছিল। অনেক বিষয়ে উলামায়ে দেওবন্দ এবং তার অনুসারীদের সাথে মত-পার্থক্য থাকলেও শিরিক এবং বিদআত নির্মূলের ক্ষেত্রে উলামায়ে দেওবন্দ এবং তারা এক ও অভিন্ন।

মাওলানা তাকি উসমানি দামাত বারাকাতুহুম লিখেছেন: যখন সৌদি আরবে উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে অপপ্রচারকারীরা প্রচার শুরু করল যে, উলামায়ে দেওবন্দ শাইখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নজদির সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করেন। তারা তার ব্যাপারে অপমানজনক উক্তি করে থাকেন। তখন মাওলানা মনজুর নুমানি (মৃত্যু: ১৪১৭ হিজরি) এই প্রোপাগাণ্ডা নিরসনের লক্ষ্যে *আলফুরকানে* ধারাবাহিক নিবন্ধ ছাপা শুরু করে দিলেন। সেখানে শাইখ আবদুল ওয়াহহাব নজদি

---

(১) কিছু তথ্য আলকাউসার: অক্টোবর ২০১৬ থেকে। মাওলানা সালমান মনসুরপুরি হাফি. বিন্যাসে প্রকাশিত ফাতাওয়া শাইখুল ইসলামে শাইখুল ইসলামের উভয় ফতোয়া রয়েছে।

ও উলামায়ে দেওবন্দের মাঝে যে যে বিষয়ে মিল রয়েছে, সেগুলোর বিবরণ প্রদান করলেন। শিরিক ও বিদআত নির্মূলে উভয়ের মাঝে যে মিল আছে, নিবন্ধে সেই বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন।(১)

শাইখুল ইসলাম মাওলানা তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর পরামর্শে উলামায়ে দেওবন্দ ও তাদের চিন্তাধারায় যে অমিল ও মত-পার্থক্য রয়েছে, মাওলানা মনজুর নুমানি রাহিমাহুল্লাহ তাও তুলে ধরেছেন। তার লেখাগুলো *শাইখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব কে খেলাফ প্রোপেগাণ্ডে আওর হিন্দুস্তান কে উলামায়ে হক পর উসকে আছারাত* নামে মুদ্রিত। আরবি ভাষায়ও তা অনূদিত, যা *দিআয়াতুন মুকাসসাফাতুন জিদ্দাশ শাইখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব* নামে ১৪৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত।(২)

ভূতের মুখে রাম নাম!

শিরিক-বিদআতের সমর্থক মৌলভিগণ এবং সাধারণ বিদআতিরা তওহিদ এবং সুন্নতের প্রচার, শিরিক এবং বিদআত প্রতিরোধে পরিচালিত যে কোন কর্মতৎপরতাকে *ওয়াহাবি মতবাদ* নামে এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে 'ওহাবি' নামে পরিচিত করে। তাদেরকে *কাফের* আখ্যা দিয়ে থাকে! এর উদ্দেশ্য হল তওহিদপন্থীরা যেন কবর-পূজা, তাজিয়া-পূজা, রসম-রেওয়াজ এবং অলীক কল্প-কাহিনী ইত্যাদির খণ্ডনের পরিবর্তে এই আরোপিত অপবাদ খণ্ডনে ব্যস্ত হয়ে থাকেন। আর এই সুবাদে শিরিক এবং বিদআতপন্থীরা তাদের উদ্দেশ্য হাসিলে সমর্থ হয়। শাহ ইসমাইল শহিদ রাহিমাহুল্লাহ এবং শীর্ষস্থানীয়

---

(১) বরণ্যদের স্মৃতিচারণ, তাকি উসমানি, পৃ. ৪৪৭, মাকতাবাতুল আশরাফ ঢাকা।

(২) নুকুশে রফতে গাঁ: বরণ্যদের স্মৃতিচারণ, পৃ. ৪৪৫, তাকি উসমানি, মাকতাবাতুল আশরাফ ঢাকা। মাসিক আলকাউসার: অক্টোবর ২০১৬। আরো দেখুন: দিআয়াতুন মুকাসসাফাতুন জিদ্দাশ শাইখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব।

উলামায়ে দেওবন্দের বিষয়ে ওয়াহাবি হওয়ার অপবাদ ইংরেজ এবং বিদআতিদের তরফে-ই আরোপিত হয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় হল যে, বর্তমানের বিদআতিরা তো আকাবিরে দেওবন্দকে *ওয়াহাবি* বলে গালি দেয়। কিন্তু ওয়াহাবি বলে যাদের কাতারে শামিল করতে চায় সরাসরি তাদেরকে-ই যদি জিজ্ঞেসা করা হয়, তাহলে তারা জবাব দিবেন যে, দেওবন্দের লোকেরা আমাদের দলভুক্ত নয়। তাদের এবং আমাদের মাঝে অনেক বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে!(১)

আরো মজার ব্যাপার হল যে, আবদুল ওয়াহহাব ছিলেন ইমামুদ দাওয়াহ শাইখ মুহাম্মাদ নজদি রাহিমাহুল্লাহুর পিতা। তিনি ছেলের এই দাওয়াতি কার্যক্রমের বিরোধিতা করতেন। সুতরাং যারা ছেলে মুহাম্মাদের অনুসারি হবেন, তাদেরকে *মুহাম্মাদি* বলা উচিত এবং যারা বিদআতি পিতা আবদুল ওয়াহহাবের অনুসারী এবং মাজারি চিন্তা-চেতনা লালন করবেন, তাদেরকে *ওহাবি* বলা উচিত! এ হিসেবে যদি আমাদেরকে কোন নামে নামকরণ করতে-ই হয়, তাহলে ছেলের নামনুসারে *মুহাম্মাদি* নামে নামকরণ করা হোক! আমরা তা সানন্দে গ্রহণ করব। যেহেতু আমরাও শিরিক-বিদআতের কট্টর বিরোধী। আর মাজারপন্থীদেরকে বাবার নামে *ওয়াহাবি* বলা অধিক যৌক্তিক। যেহেতু তার পিতার মতো তারাও শিরিক-বিদআত এবং মাজারপূজায় লিপ্ত। কিন্তু অতি আশ্চর্যের ব্যাপার হল যে, তারা নিজেরা ওয়াহাবি হওয়া সত্ত্বেও আমাদেরকে ওয়াহাবি ট্যাগ দেয়। এমন আচরণ ভূতের মুখে রাম নামের তসবিহ জপা নয় তো! ([২])

---

(১) মাসিক আলকাউসার: অক্টোবর ২০১৬।

([২]) মাওলানা মনজুর নুমানি রাহিমাহুল্লাহ এ কথাকে-ই চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি লিখেন:

ولا يعزبن عن البال أن الجماهير الجهلة والدهماء البسطاء، كانوا يعتقدون أن عبد الوهاب النجدي» هو مؤسس الوهابية» وهو الذي تولى كبرها، فكانوا يشفون غليل حنقهم وغيظهم بتوجيه الملام والشتائم إليه، وكانوا لا يعرفون

সবিশেষ আরববসন্তের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস এবং মুহাক্কিক আলেমে দীন শাইখ আবুল ফাতুহ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ খালেদি হালবি রাহিমাহুল্লাহুর বক্তব্যের মাধ্যমে এই আলোচনার ইতি টানছি। তিনি শাইখে নজদি রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে যথাযথই বলেছেন:

> শাইখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহু তাআলা ছিলেন দাওয়াতের ময়দানে একজন ইমাম। তিনি ছিলেন সর্বসম্মতিক্রমে দাওয়াতের ময়দানে একজন ইমাম এবং আল্লাহর দিকে আহবানকারী। তিনি তার অবস্থা, নিবন্ধ, আমল এবং কলম দ্বারা দাওয়ার কাজ আনজাম দিয়েছেন। আমি সর্বদা-ই তার বড়ত্ব, মহত্ত্ব, পাণ্ডিত্য এবং দাওয়াতি কাজে লেগে থাকার এবং আল্লাহর দিকে দাওয়াতে অগ্রণী ভূমিকা রাখার কথা স্বীকার করে থাকি। এটি এমন দাওয়াত, যা কুসংস্কার ও কু-প্রথা থেকে আকিদার শোধনে এবং আল্লাহর কালিমা বুলন্দিতে উৎকৃষ্টতর ফলাফলও দিয়েছে। ইলমের প্রচার, উলামাদের প্রাচুর্যতা এবং ইলমি ইনস্টিটিউটের প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে তার কীর্তিসমূহের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যা ছিল তার উৎকৃষ্ট দাওয়াতি কর্মপন্থার একটি

أصلا أن الذي ه دم القباب على الضرائح، وحمل اللواء ضد سجدة القبور، والنذر والذبح لها، والتضرع إليها، والسؤال إياها، وما إليه من الشرك، هو في الواقع ابن الشيخ عبد الوهاب النجدي، محمد، الذي يعرف في التاريخ بالشيخ محمد بن عبد الوهاب . وكان الشيخ عبد الوهاب الحنبلي من كبار علماء وفقهاء عصره، وقاضي عيينة» وحريملا»، ولكنه ظل يعيش (في الواقع العملي) في عزلة –من أجل ما فطر عليه من حب الهدوء والسكون– من الحركة التي قام بها ابنه محمد، ومن نشاطاته وجده واجتهاده، ولكي يعيش في عزلة تامة من كل ذلك هاجر مسقط رأسه عيينة» إلى حريملا» لأن عيينة صارت مركز دعوة الشيخ محمد وجهوده.. . يعف ذلك لك من له اطلاع على تاريخ هذه الأسرة الكريمة، وقد قال الشيخ أحمد زيني دحلان– وهو أشد معارضي الشيخ محمد وحركته– في كتابه خلاصة الكلام»: إن الشيخ عبد الوهاب كان شديد الخلاف لحركة ابنه ودعوته. الدعاية، ص ৫৩–৫৪.

> প্রভাব মাত্র। ইসলাম এবং মুসলমানদের কল্যাণে প্রত্যেক শহরে তার অবদান স্পষ্ট ।(১)

সারকথা হল, তওহিদের প্রচার-প্রসার এবং শিরিক-বিদআতের মূলোৎপাটনে আমরা উভয় এক ও অভিন্ন। আমাদেরকেও এই চেতনায় ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

---

(১) কালিমাতুন ফি কাশফি আবাতিলা ওয়া ইফতিরাআত, পৃ. ২৪, আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, মাকতাবুল মাতবুআত আলইসলামিয়া হালব, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪১১ হিজরি।

পরিশিষ্ট-৪

ওয়াহদাতুল উজুদঃ আমাদের আকিদা নয়

আমরা কখনো এমন মাসআলা নিয়ে তর্কবিতর্ক করে থাকি, যা মূলত আমাদের আকিদায়-ই নয়। এর একটি হল, ওয়াহদাতুল উজুদের মাসআলা। হুসাইন বিন মনসুরকে নিয়ে আমাদের মাতামাতিরও শেষ নেই! কেউ তো তাকে আল্লাহর ওয়ালি প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকি! অথচ আলোচিত মাসআলা আমাদের দেওবন্দি মতাদর্শে নেই। এই অচেতনাকে চেতনা সাব্যস্ত করায় বাতিলের তরফে আমাদের বিরুদ্ধে হাজারো অভিযোগ আরোপিত হচ্ছে। অথচ তা একটি শিরকি আকিদা। এটা দেওবন্দি মতাদর্শের কোন আকিদা হতে পারে না।

একদিন আসরের পর হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহুকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেনঃ এই আকিদা দেওবন্দি মতাদর্শে-ই নেই। যখন আমাদের আকিদাতে নেই, তাহলে প্রশ্ন কীসের! সাধারণ মানুষের রোষানাল থেকে বাঁচতে গিয়ে হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রাহিমাহুল্লাহসহ অন্যান্যরা ওয়াহদাতুশ শুহুদের নামে এর ব্যাখ্যা করেছেন।(১)

সুতরাং হুসাইন বিন মনসুর হাল্লাজকে আল্লাহর ওয়ালি বা তাকে কাফের সাব্যস্ত করাতে আমাদের জন্য কোন ফায়দা নেই। এ বিষয়ে আলোচনা করা-ই বেহুদা। যেহেতু এই আকিদা আমাদের নয়, তাই তাকে কাফের সাব্যস্ত করে বা তাকে আল্লাহর ওয়ালি বানিয়ে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করাতে আমাদের সময় অপচয় ছাড়া অন্য কোন ফায়দা নেই। অতএব, এই মাসআলায় আমাদেরকে চুপ থাকা-ই শ্রেয় ও নিরাপদ।

---

(১) ওয়াহদাতুল উজুদ এবং ওয়াহদাতুশ শুহুদঃ সংজ্ঞা ও ফরক জানতে দেখুনঃ শরিয়ত ও তরিকত, পৃ. ৩০৯, থানভি, মাকতাবাতুল হক বোম্বে, ভারত।

মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: মনসুর অপারগ ছিল। বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল! তার ওপর কুফরির ফতোয়া দেয়া অনর্থক। তার ব্যাপারে চুপ থাকা-ই শ্রেয়। তখন ফিতনা দমনের জন্য তাকে হত্যা করাও জরুরি ছিল।(১)

তারা ছিল এক সম্প্রদায়-যারা গত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, তা তাদের-ই জন্যে। তারা কী করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না। (২)

হুসাইন বিন মনসুরের হিন্দুস্তানে আগমন

মাওলানা সায়্যিদ মানাজির আহসান গিলানি রাহিমাহুল্লাহ আশ্চর্জজনক একটি তথ্য লিখেছেন যে, সর্বপ্রথম মুসলিম-সমাজে *আনাল হকের* স্লোগান হুসাইন বিন মনসুর-ই বুলন্দ করেছিল। জানেন সে কে? খতিব বাগদাদি *তারিখে বাগদাদে* সন্ধান দিয়েছেন যে, তার দাদা ছিল অগ্নিপূজক। (৩) শুধু তাই নয়, তিনি তার ছেলের সূত্রে দীর্ঘ একটি রেওয়ায়েত নকল করেছেন। সেখানে তার হিন্দুস্তান সফরের কথা উল্লেখ রয়েছে। তার প্রত্যাবর্তনের পর হিন্দুস্তান থেকে মানুষ তার সাথে চিঠি আদান-প্রদান করত। যাই হোক এখন আমাকে না তাকে নিয়ে এবং না আলোচ্য মাসআলা *আনাল হক* নিয়ে তর্ক করা উদ্দেশ্য, বরং এ কথা বলতে চাই যে, একটি সাদামাটা কথা ইসলামিক ইতিহাসে অস্বাভাবিক গুরুত্ববহ হয়ে যাওয়া নিশ্চয় বহিরাগত সংস্কৃতির-ই প্রভাব।(৪)

---

(১) ফাতাওয়া রশিদিয়া, পৃ. ১০৭, তালিফাতে রশিদিয়ার সাথে মুদ্রিত।

(২) বাকারা: ১৩৪।

(৩) তারিখে বাগদাদ, ৮/১১২।

(৪) মুসলমানোঁ কি ফিরকাহ বন্দোঁ কা আফসানা, পৃ. ৮০-৮৬, মাকতাবায়ে হক বোম্বে, ভারত।

পরিশিষ্ট-৫

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহঃ অপব্যাখ্যা বর্জনীয়

কুরআন-হাদিস বা মাসলাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সঠিক তরজুমানির অপর নাম হচ্ছে, দেওবন্দিয়াত। আর উলামায়ে কেরাম হচ্ছেন দীনের পাহারাদার মাত্র, ঠিকাদার নয়। অতএব, আমাদেরকে যথাযথ পাহারাদারির দায়িত্ব আদায় করা উচিত।

জিহাদঃ ইসলামের একটি বিশেষ পরিভাষা। এ শব্দ শোনা মাত্র তাগুতবাহিনীর যা বুঝে আসে, তাকে-ই জিহাদ বলে! নববি যুগে সাহাবায়ে কেরামরা *হাইয়া আলাল জিহাদের* আহবান শোনার সাথে সাথে তীর, তলোয়ার, ঘোড়া এবং ঢাল ইত্যাদি নিয়ে রণাঙ্গনের দিকে দৌঁড়াতেন। তখন কেউ-ই তো বলতেন না যে, আমি নামাজ পড়ি, স্ত্রীর খেদমত করি, তসবিহ আদায় করি বা অন্যান্য দীনি কাজ করি। আমিও তো জিহাদে আছি! জিহাদের অপব্যাখ্যাকারী কোন মুলহিদ কিয়ামত অবধি এর কোন দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ।

আমরা অনেকে জিহাদের অপব্যাখ্যা করে থাকি। আবার কেউ জিহাদ নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে থাকি। উভয় তরিকা সঠিক নয়। আরে ভাই, জিহাদ না করতে পারলেও নিতান্তপক্ষে এর অপব্যাখ্যা করা থেকে বিরত থাকুন। আজ আমাদের এই দূরাবস্থার মূল কারণ হল, আল্লাহর বিধান জিহাদ ছেড়ে দেয়া।

জিহাদঃ কুরআন-হাদিসের একটি বিশেষ পরিভাষা। জিহাদ বলা হয়ঃ দীনে ইসলামের হেফাজত এবং আল্লাহর কালিমা সুউচ্চ করার লক্ষ্যে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে নিজেদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করা। কুরআন-হাদিসের যেখানে জিহাদ শব্দ আছে। কোথাও স্রেফ **جهاد** বা **مجاهده** এসেছে আবার কোথাও সাথে **في سبيل الله** এসেছে। কখনো **الله** শব্দ অথবা এর দিকে প্রত্যাবর্তিত **ضمير** এসেছে। এমনিভাবে **في سبيل الله** কখনো একাকী, আবার কখনো **جهاد** শব্দমূলের সাথে

এসেছে। অতএব, যেখানে مجاهده শব্দ উন্মুক্ত অথবা পরে الله বা فينا এসেছে, সেসব আয়াত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। ব্যাখ্যাকারীরা সে স্থানে دين শব্দ উহ্য ধরেছেন। কিন্তু যেখানে جهاد শব্দ অথবা مجاهده শব্দমূলের সাথে في سبيل الله বা শুধু في سبيل الله এসেছে। যেমন: জাকাতের খাত বর্ণনায় এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করার ফজিলতে। সেসব স্থানে জিহাদ দ্বারা ইসলামের বিশেষ পরিভাষা-ই উদ্দেশ্য।

মুফতিয়ে আজম মুফতি মুহাম্মাদ শফি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: সাধারণ পরিভাষায় যখন জিহাদ শব্দ বলা হয়, তখন সাধারণত ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা বুঝায়। যার প্রতিশব্দ হিসেবে কুরআনে কারিম قتال বা مقاتلة শব্দ ব্যবহার করেছে।(১)

শাইখুল ইসলাম মাওলানা মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ বলেন: জিহাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ যদিও চেষ্টা-সাধনা এবং আল্লাহ তাআলার দীনের জন্য যাবতীয় মেহনতকে শামিল করে। কিন্তু পরিভাষায় জিহাদ এমন আমলকে বলা হয়, যেখানে দুশমন বা কাফেরের সাথে মোকাবেলা রয়েছে। মোকাবেলা হতে পারে কাফেরদের আক্রমণকে প্রতিহত করতে কিংবা মুসলমানগণ কোন কাফেরের ওপর প্রথমে হামলা করতে। বর্ণিত উভয় সুরত-ই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। উভয় সুরত-ই শরিয়ত-সমর্থিত।(২)

সুরা তওবার যেখানে-ই এমন আয়াত এসেছে, সেখানে শাহ আবদুল কাদির দেহলভি রাহিমাহুল্লাহ *সশস্ত্র যুদ্ধ* অর্থ করেছেন। তার-ই অনুকরণে শাইখুল হিন্দ রাহিমাহুল্লাহুও এমনি করেছেন। হাদিসগ্রন্থে *আবওয়াবুল জিহাদ বা আবওয়াবু ফাজায়িলিল জিহাদ* যেখানে এসেছে, সেখানে এই বিশেষ পরিভাষা-ই উদ্দেশ্য। কিন্তু তাবলিগি ভাইয়েরা এই সমস্ত আয়াতকে ব্যাপক করে দিয়েছেন! ব্যাপক নয়, বরং নিজেদের কাজের সাথে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন! তারা তাবলিগকে-ই জিহাদ বলে

(১) জাওয়াহিরুল ফিকহ।

(২) দরসে তিরমিজি, ৫/১৯৯, কাদিমি কুতুবখানা আরামবাগ, করাচি।

থাকেন! অন্যান্য দীনি কাজ: দরস ও তাদরিস, তাসনিফ, তালিফ ইত্যাদিকে তারা জিহাদ বলেন না! তাদের মূর্খরা এ সবকে দীনি কাজ-ই মনে করে না! যখন তারা দাওয়াত ও তাবলিগকে জিহাদ সাব্যস্ত করল, তখন কুরআন-হাদিসে উল্লিখিত জিহাদের আয়াত-হাদিসকে নিজেদের কাজে ফিট করে দিল। তাবলিগিদের এমন আচরণ সঠিক নয়।

জিহাদ ইসলামিক একটি পরিভাষা। কুরআন-হাদিসে এই শব্দ বলা হলে *কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ-ই* উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। হ্যাঁ, কিছু কাজ-কর্ম এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে। একে সংযুক্ত করা-ই হল এর ফজিলত। যেমনিভাবে হাদিসে এসেছে: *যে ব্যক্তি ইলম অর্জনে বের হল, সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায়।* (১) তো এই হাদিসে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তলবে ইলমকে *ফি সাবিলিল্লাহ* আখ্যায়িত করেছেন। এই সংযুক্ত করা-ই তালেবে ইলমের ফজিলত। কুরআন-হাদিসে জিহাদের ফজিলতে বর্ণিত সমস্ত আয়াত এবং হাদিস তালেবে ইলমের ওপর ফিট করা যাবে না, তাবলিগিদের ওপরও না।(২)

তাবলিগ জামাআতকর্তৃক এই বিকৃতির বিষয়ে হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু খুবই সতর্ক ছিলেন। তাবলিগের মুরুব্বি মরহুম মাওলানা উমর পালনপুরির সাথে এ বিষয়ে তার দীর্ঘ চিঠি আদান-প্রদান হয়েছে, সরাসরিও আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু -ই হয়নি।(৩)

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু আরো বলেন: তাবলিগ জামাআতের কিতাব *মুন্তাখাব হাদিসে* দাওয়াত ও তাবলিগের ফজিলত

---

(১) সুনানে তিরমিজি: ২৬৪৭।

(২) তুহফাতুল আলমায়ি, ৪/৫৫১-৫৫২, তুহফাতুল কারি, ৬/১৮৮।

(৩) বিস্তারিত দেখুন: তুহফাতুল আলমায়ি, ৪/৫৬৩-৫৬৬ পর্যন্ত।

বয়ান করতে গিয়ে *মিশকাতুল মাসাবিহের* পুরা 'কিতাবুল জিহাদ' নকল করা হয়েছে, যা সরাসরি দীনে ইসলামের বিকৃতি।(১)

মুজাহিদে ইসলাম মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মান হাফিজাহুল্লাহ কুরআনে কারিমের নিম্নোক্ত আয়াত: "গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান, যাদের কোন সঙ্গত ওজর নেই এবং ঐ সব মুসলমান যারা জান এবং মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে,তারা সমান নয়। যারা জান এবং মাল দিয়ে জিহাদ করে গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় আল্লাহ তাআলা তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদেরকে উপবিষ্টদের ওপর মহান প্রতিদান দিয়ে শ্রেষ্ঠ করেছেন।"(২) এর ব্যাখ্যায় লিখেন: আয়াতে দুই প্রকার মানুষের আলোচনা করা হয়েছে: গৃহে উপবিষ্ট মুসলমানগণ এবং মুজাহিদগণের। এখানে গৃহে উপবিষ্ট লোকদের মোকাবেলায় মুজাহিদদের আলোচনা করা এ কথার দলিল যে, জিহাদের অর্থ শুধু-ই শুধু যুদ্ধ করা। কেননা বসে থাকা লোকদের মধ্যে ঐ সমস্ত মানুষও ছিল, যারা দীনের কোন না কোন কাজ করছেন। কিন্তু জিহাদ করছেন না, তারা পাঠদান বা লেখালিখি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন বা খানকায় জিকিরে মগ্ন ছিলেন অথবা ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষকে নামাজ-রোজার দিকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন।

এজন্য বিশেষভাবে সেসব ভাইদের কাছে সবিনয় আবেদন করব, যারা দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ করছেন: মাশাআল্লাহ, তারা অনেক ভালো কাজে লেগে আছেন। কিন্তু তারা নিজেদের কাজকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ, বরং এ থেকে মর্যাদাবান মনে করেন এবং অন্যান্য দীনি কর্মীদেরকে এমনকি মুজাহিদদেরকেও মূল দীনের মেহনতকারী মনে করেন না! তাদের উচিত হবে এই আয়াতের তাফসির জানার জন্য মাওলানা মুহাম্মাদ ইহতিশামুল হাসান সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর পুস্তিকা

(১) বাদ আসর: ইলমি মজলিস। দেখুন: মুন্তাখাব হাদিস, পৃ. ৭৪১-৮২০ পর্যন্ত, দারুল কিতাব ঢাকা।

(২) সুরা নিসা: ৯৫।

মুসলমানো কি মওজুদা পসতিকা ওয়াহিদ ইলাজ জরুরি ভিত্তিতে পাঠ করা।

তিনি বইটি তাবলিগের প্রতিষ্ঠাতা আমির মাওলানা ইলিয়াস রাহিমাহুল্লাহুর নির্দেশে রচনা করেছেন, যা বর্তমানে ফাজায়েলে আমলের নিয়মিত অংশ। তিনি সেখানে লিখেছেন: যদিও উপরিউক্ত আয়াতে জিহাদ দ্বারা কাফেরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোকে বুঝানো হয়েছে, যদ্দারা ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং কুফর ও শিরিক পরাজিত হয়। কিন্তু যদিও দুর্ভাগ্যবশত আজ আমরা সেই মহান সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত। তথাপি এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমাদের পক্ষে যতটুকু চেষ্টা ও মেহনত করা সম্ভব, তাতে কখনো-ই কমি না করা চাই। আমাদের এই মামুলি চেষ্টা ও মেহনত আমাদেরকে ধীরে ধীরে আগে বাড়িয়ে দিবে। *যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্য-ই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।(১)*

নফসের জিহাদ বড় জিহাদ!

অপব্যাখ্যাকারীরা বলে থাকেন যে, নফসের জিহাদ হচ্ছে, বড় জিহাদ এবং ময়দানের জিহাদ ছোট জিহাদ! এ কথা সঠিক নয়। আসলে তারা মুজাহাদা: চেষ্টা-সাধনাকে জিহাদ, বরং বড় জিহাদ বানিয়ে ফেলেছে! এ ক্ষেত্রে তারা একটি বানোয়াট হাদিসও পেশ করে যে, "আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদ তথা ইলম-আমলের দিকে

(১) সুরা আনকাবুত: ৬৯। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ আওর ইতিরাজাত কা ইলমি জায়েজা, পৃ. ৬১-৬২, মুসলমানো কি মওজুদা পসতিকা ওয়াহিদ ইলাজ, পৃ. ২১, বাংলা ফাজায়েলে আমলের সাথে মুদ্রিত।

ফিরে এলাম।"(১) প্রথমত এই হাদিসটি সহিহ নয়। এটা বানোয়াট একটি কথা। যদি সহিহ ধরেও নিই, তবুও এর সঠিক ব্যাখ্যা হবে যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে বলতে চাচ্ছেন যে, তোমরা যুদ্ধ ছাড়াই তাবুক থেকে ফিরে এসেছ। এজন্য এ কথা মনে কর না যে, আজ রোমানরা আমাদের মোকাবেলায় আসার সক্ষমতা রাখেনি, তাই এখন থেকে হাত ধৌত করে ঘরে বসে থাকব। আর জিহাদের প্রয়োজন নেই! ওহে শোনো! এখানে শেষ নয়, তাদের সাথে আজ যুদ্ধ হয়নি ঠিক। শীঘ্র তাদের সাথে বড় যুদ্ধ হতে যাচ্ছে। অতএব, তোমরা সেই বড় জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ কর। এ কথা বলে কায়সার-কিসরার সাথে আগত বৃহত্তম যুদ্ধের দিকে ইশারা করেছেন, যার সু-সংবাদ আগে-ই দিয়ে রেখেছেন। অতঃপর হজরত উমর রাদিয়াল্লাহুর যুগে সেই বড় জিহাদের ডাক আসে। শেষতক কায়সার-কিসরার রাজ্য মুসলমানদের করতলগত হয়েছে এবং আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়। (২)

হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আজকাল সাধারণত মানুষ মনে করে যে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা ছোট জিহাদ এবং আত্মশুদ্ধির মুজাহাদা হচ্ছে বড় জিহাদ! যেরূপ তারা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করাকে বিজনে আত্মশুদ্ধি থেকে অধম মনে করছে। অথচ তা বিশুদ্ধ রুচি নয়, বরং এতে ব্যাখ্যা রয়েছে। আর তা

---

(১) হাদিসটি বায়হাকি কৃত কিতাবুজ জুহদে রয়েছে। বায়হাকি একে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন: এর কোন ভিত্তি নেই। (মাজমুউল ফাতাওয়া, ১১/১৯৭) আলবানি রাহিমাহুল্লাহ একে মুনকার বলেছেন। (সিলসিলাতুল আহাদিসিজ জয়িফাতি ওয়াল মাওজুআতি ওয়া আসারুহাস সায়িউ ফিল উম্মাহ, ২৪৬০) ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তা লোকমুখে প্রসিদ্ধ কথা। (তাসদিদুল কওল, কাশফুল খাফা ওয়া মুজিলুল ইলবাসের সূত্রে) আরো দেখুন: কাশফুল খাফা ওয়া মুজিলুল ইলবাস, ১/৪৮৬, হাদিস: ১৩৬২, তাহকিক: হিন্দাভি।

(২) আরো দেখুন: তুহফাতুল আলমায়ি, ৪/৫৫৫।

হল, কাফেরদের সাথে এখলাসবিহীন যুদ্ধ হলে, তা বাস্তবতায় আত্মশুদ্ধির সাধনা থেকে নিম্নমানের। তখন এই মুজাহাদায়ে নফস তা থেকে উত্তম। এমন কিতাল মাআল কুফফারকে 'জিহাদে আসগর' এবং বিপরীত মুজাহাদায়ে নফসকে 'জিহাদে আকবর' বলা হয়েছে। কিন্তু কিতাল মাআল কুফফার নিষ্ঠার সাথে হলে একে জিহাদে আসগর বলা অদার্শনিক সুফিদের অতিরঞ্জন, বরং এমন কিতাল মাআল কুফফার হচ্ছে, জিহাদে আকবর-ই। এমন লড়াই নির্জনে আত্মশুদ্ধির চেষ্টা-সাধনা থেকে শ্রেষ্ঠ। কেননা যে কিতাল মাআল কুফফার এখলাসের সহিত হবে, তা মুজাহাদায়ে নফসকেও অন্তর্ভুক্ত রাখে। সুতরাং এতে উভয় জিহাদের মর্যাদা একত্রিত হয়ে যাবে।(১)

পাঠদান কি জিহাদ?

আমাদের অনেক নাদান ভাইয়েরা মাদরাসায় পড়া-পড়ানোকেও জিহাদ বলে চালিয়ে দেন! তা মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। মুজাহিদে ইসলাম মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মান দা.বা. বলেন: আমি প্রায় দশ-পনেরো বছর যাবৎ জিহাদ করছি না, তাই বলে কি আমার পাঠদান এবং আহলে হাদিসের বিরুদ্ধে মুনাজারাকে জিহাদ বলে দেব? কস্মিনকালেও এমন হতে পারে না।(২)

জিহাদ: দরসে বুখারি থেকে

বাদ মাগরিব। সহিহুল বুখারি কিতাবুল জিহাদে আজকের দরস হবে। পরীক্ষা একেবারে-ই সন্নিকটে। হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু মসনদে আসন গ্রহণ করলেন। শুরুতে-ই বললেন, পরীক্ষা সামনে, দীর্ঘ আলোচনা করব না। তবুও আমাকে দু-চারটি কথা না বললে না হয়। তোমাদের কারো রেকর্ড করার ইচ্ছা থাকলে করতে পার। তবুও দীনের স্বার্থে আমাকে তা বলতে হবে।

---

(১) আলইফাজাতুল ইয়াউমিয়া, মালফুজ নম্বর ১০৪১, থানভি।

(২) জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ আওর ইতিরাজাত কা ইলমি জায়েজা, ইলিয়াস ঘুম্মান।

দেখুন, এটা হচ্ছে কিতাবুল জিহাদ। জিহাদের অর্থ কী এবং মর্ম কী? তাবলিগ জামাআত যা বলে তা নয়! তা তো দীনের তাহরিফ। জিহাদের সঠিক অর্থ তা-ই, যা আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি (মৃত্যু ৮৫৫ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ (*উমদাতুল কারিতে*) উল্লেখ করেছেন। শরিয়তের পরিভাষায় জিহাদ বলা হয় যে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধে আল্লাহর কালিমা সুউচ্চ করার লক্ষ্যে নিজেদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করা...।(১) অতএব, যারা-ই জিহাদের অপব্যাখ্যা করেছেন, তা পরিত্যাজ্য ও বর্জনীয়। চাই তিনি আমার শাইখ কুদ্দিসা সিররুহু (শাইখুল হাদিস জাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহ) হোন বা তিনি হোন না কেন মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহি সিররুহু। যারা-ই অপব্যাখ্যা করেছেন, তা বাতিল ও পরিত্যাজ্য বলে বিবেচিত হবে এবং একে দীনের তাহরিফ ধরা হবে।(২)

জিহাদ ইসলামি শিক্ষার কোন অংশ নয়?

মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিনদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ইসলামিক ইতিহাসের কোন কালে-ই যতদিন পর্যন্ত কোন না কোন রূপে ইসলামি হুকুমত বিদ্যমান ছিল। বিজ্ঞ কোন ফকিহ কিংবা কোন অভিজ্ঞ মুফাসসির এই ধরনের কোন ধারণা পোষণ করেননি যে, জিহাদ ও

---

(১) উমদাতুল কারি, ১১/৩৬৭, আল মাকতাবাতুত তাওফিকিয়া মিশর, দ্বিতীয় সংস্করণ। আরো দেখুন: আলমাউসুআতুল ফিকহিয়াতুল কুয়েতিয়া, ১৬/১২৪, ফতহুল কাদির, ৪/২৭৭, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া, ২/১৮৮, আলখারাশি, ২/১০৭, জাওয়াহিরুল ইকলিল, ১/২৫০, শরহুজ জুরকানি আলাল মুয়াত্তা, ২/২৮৭, হাশিয়াতুল বাজুরি, ২/২৬৮।

(২) দেখুন: তাবলিগবিরোধিতার চাবুক জবাব, পৃ. ৭৯-৮৬, শাকের হোসাইন শিবলি অনূদিত, মাকতাবাতুল আজিজ ঢাকা। মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহি রাহিমাহুল্লাহ একটি প্রশ্নের জবাবে বলেছেন: তলোয়ারের যুদ্ধ করলে যে বদলা পাওয়া যাবে, এরচে বেশি প্রতিদান এক নম্বর পথ তথা দাওয়াতের বদলায় পাওয়া যায়! (হজরত মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহি আওর জামাআতে তাবলিগ, পৃ. ২৯৩, তাবলিগ সমালোচনার জবাব বইয়ের সাথে।)

কিতাল ইসলামিক শিক্ষার কোন অংশ নয়। আশ্চর্যের বিষয় হল যে, যখন থেকে মিশরসহ অন্যান্য মুসলিম দেশের উপর ইউরোপীয় শক্তির প্রভাব বিস্তার হল, তখন এই ধরনের নতুন কথা উদ্ভব হতে লাগল যে, ইসলামে কোন যুদ্ধ নেই, কোন কিতাল নেই! আর জিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, লেখালিখি করা, বক্তৃতা দেয়া এবং দাওয়াত ও তাবলিগের মেহনত করা! এ ছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য নয়!(১)

জিহাদ একটি মজলুম ফরজ!

মাওলানা তাকি উসমানি বলেন: আজ দীনের একটি মহান রোকনের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করব। যেটি আমাদের কাছে দীর্ঘকাল থেকে অবহেলিত। ইসলামের সেই মহান রোকনটির নাম হচ্ছে জিহাদ। জিহাদ গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ এবাদত অথচ আমাদের ওয়াজ মাহফিলগুলোতে জিহাদ বিষয়ে আলোচনা হয় না। আমাদের সভা-সমাবেশগুলোকে এই আলোচনা থেকে অনেক দূরে রাখা হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জিহাদের বিকৃতিসাধন থেকে হেফাজত করুন। আমিন॥ (২)

---

(১) মাজমুয়ায় তাফাসিরে ইমাম সিনদি, পৃ. ১১৭, মোল্লা ইয়ার মুহাম্মাদকৃত একটি মজলুম ফরজ, পৃ. ৭০ থেকে।

(২) ইসলাহি খুতবাত, ১৪/ ৭৭, অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মাদ উমায়ের কোব্বাদি, দারুল উলুম লাইব্রেরি ঢাকা।

পরিশিষ্ট-৬

সিফাতে বারি তাআলাঃ আমাদের অবস্থান

প্রথমেই আমাদেরকে জেনে নেয়া জরুরি যে, ইলমে কালাম তথা আকিদাশাস্ত্রে তিনটি মাজহাব রয়েছে। আশায়িরা, মাতুরিদিয়া এবং সালাফিয়া।(১) এই তিন মাজহাব-ই على سبيل الاجتماع তথা এক সাথে তিনটা-ই সঠিক। আশায়িরা এবং মাতুরিদিয়াদের মাঝে শাখাগত মাত্র ১২টি মাসআলায় মতভেদ রয়েছে।(২) আর আশআরি এবং মাতুরিদিদের সাথে সালাফিদের মাত্র একটি মাসআলায় মত-পার্থক্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে, সিফাতে মুতাশাবিহাত যেমন: استواء على العرش، وَجْهٌ، يَدٌ ইত্যাদির ব্যাখ্যা করা জায়েজ কিনা? সালাফিদের দৃষ্টিতে তা নাজায়েজ এবং বাকিদের মতে জায়েজ।

তবে জেনে রাখা উচিত যে, এই ব্যাখ্যা শুধু অসুস্থ মস্তিষ্কের লোকদের জন্য বৈধ। কিন্তু আজকাল তাবিল বা ব্যাখ্যা করা যেন আমরা দেওবন্দিদের মূল মাজহাব হয়ে গেছে, তা সঠিক নয়।(৩)

---

(১) বর্তমানে মাজহাব অস্বীকারকারীদেরকে আমরা সালাফি বলে থাকি, তা ঠিক নয়। সালাফিয়াতের সম্পর্ক আকিদার সাথে, ফিকহের সাথে নয়। সালাফিয়াত ইলমে কালামের একটি মাজহাব। ফিকহ, তাকলিদ করা এবং না করার সাথে এর কোন যোগসূত্র নেই। দেখুনঃ রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ, ১/৬৪৫, আরো দেখুনঃ আসল সালাফি ও আজকের সালাফি, মুফতি সাইদ আহমাদ (ইলমি খুতবাতের একাংশ)

(২) হজরত আহমাদ বিন সুলাইমান ইবনে কামাল পাশা (মৃত্যু ৯৪০ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ এই ১২ মাসআলা একটি পুস্তকে একত্রিত করেছেন, যা "রিসালাতুল ইখতিলাফি বাইনাল আশায়িরাতি ওয়াল মাতুরিদিয়াতি ফিসনাই আশারা মাসআলাতান" নামে মুদ্রিত। রিসালাটি পড়ুনঃ রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআর ১ম খণ্ডে, পৃ. ৪৭ এর টীকায়।

(৩) রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ, ১/৫০।

আহলে হকের দৃষ্টিভঙ্গি

মুহাদ্দিসিন, আশআরি এবং মাতুরিদিদের মতে আল্লাহ তাআলার জন্য সিফাত প্রমাণিত। আর তা এক হিসেবে পৃথক অর্থাৎ বাস্তবতা এবং অর্থ হিসেবে ওয়াজিবে তালালা থেকে ভিন্ন। কিন্তু অস্তিত্বের ক্ষেত্রে অভিন্ন। এজন্য সিফাত না ওয়াজিবে তাআলা এবং না অন্য কিছু, বরং এই দুটোর মাঝামাঝি অবস্থানে। সুতরাং অসংখ্য قدماء এর অবৈধতা সৃষ্টি হবে না। অতঃপর সিফাতে বারি তাআলার ক্ষেত্রে আহলে হকের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান হয়ে গেল:

১- اَلتَّنْزِيْهُ مَعَ التَّفْوِيْضِ অর্থাৎ সৃষ্টির সদৃশ থেকে আল্লাহ তাআলার গুণাবলীর পবিত্রকরণ এবং গুণাবলীর কৈফিয়ত আল্লাহ তাআলার সোপর্দ করা। বলা হবে যে, আল্লাহর শ্রবণ, দেখা, জানা, আরশে আসীন হওয়া ইত্যাদি সৃষ্টিজাতির শোনা, দেখা, জ্ঞাতার্থ হওয়া এবং শাহি মসনদে বিরাজমান হওয়ার মতো নয়। তাহলে এই সিফাতের ধরন কী? এর উত্তরে বলা হবে: আল্লাহ তাআলা-ই স্বীয় গুণাবলীর বাস্তবতা সম্পর্কে ভালো জানেন, আমরা জানি না।(১)

এই মাজহাব-ই সঠিক ও নিরাপদ। মুহাদ্দিসগণ এবং সমস্ত সালাফ এরই প্রবক্তা ছিলেন। এরই নাম হচ্ছে, সালাফিয়াত। তাকলিদ না করার নাম সালাফিয়াত নয়। সালাফিয়াত হচ্ছে, আকিদাশাস্ত্রের একটি মাজহাব। ফিকহ এবং তাকলিদ করা/না করার সাথে এর নূন্যতম সম্পর্ক নেই।

اَلتَّفْوِيْضِ এর অর্থ হচ্ছে, ثبوت المبدأ তথা অস্তিত্ব স্বীকার করা, শেষ উদ্দেশ্য নয়। কেননা এই সমস্ত গুণাবলীর অর্থ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং পরিণাম বিশ্বাস করা জরুরি। অন্যথায় কুরআনে উল্লিখিত সাত স্থানে استواء على العرش সিফাতটি অনর্থক হয়ে রয়ে যাবে।

---

(১) আলফিকহুল আকবর, পৃ. ২৭।

সালাফের উক্তি الاستواءُ معلومٌ দ্বারা এটা-ই উদ্দেশ্য। স্রেফ অভিধানিক অর্থ জানা উদ্দেশ্য নয়।(১)

অতঃপর ধীরে ধীরে এমন হল যে, কিছু লোক গুণাবলীর উদ্দেশ্য এবং পরিণাম থেকে চিন্তা সরিয়ে নিল এবং ثبوت المبدأ অর্থে সিফাত তাদের মস্তিষ্কে গেঁথে বসল। তখন التَّفْوِيْضِ শুধু মুখরোচক অর্থে-ই সীমাবদ্ধ রয়ে গেল। তারা تجسيم-تشبيه এর আকর্ষণে ফেঁসে গেল। এমনিভাবে মুহাদ্দিসগণের থেকেও مجَسِّمَه- مُشَبِّه বেরুতে লাগল।

২- التنزيه مع التأويل: সৃষ্টির সদৃশ থেকে আল্লাহর গুণাবলীকে পবিত্রকরণ এবং সম্ভাবনার স্তরে আল্লাহর শাননুযায়ী অর্থ বয়ান করা। মুতাকাল্লিমদের (আশআরি-মাতুরিদি) মাজহাব এটা-ই। অসুস্থ চিন্তায় জর্জরিত লোকদেরকে ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করতে তারা এমন মত গ্রহণ করেছেন। কেননা গুণাবলীর যদি উপযুক্ত ব্যাখ্যা করা না হয়, তাহলে দুর্বল মুমিনরা তাজসিম-তাশবিহের প্রবক্তা হয়ে যাবেন। যেমনঃ ইসতিওয়ার ব্যাখ্যা ‘ইসতিলা’ দ্বারা যদি করা না হয়, তাহলে মূর্খ লোকেরা আল্লাহকে আরশে বিরাজমান ধারণা করতে শুরু করবে। মুহাদ্দিসদের মধ্যে এমন ঘটনাও ঘটেছে। সাধারণ লোকদের আকিদা সংরক্ষণ এবং ইউনানি ফলসাফার ছোবলে বিষাক্ত মগজের অধিকারী লোকদের চিকিৎসার জন্য এই মত পছন্দ করা হয়েছে।

অতঃপর কালের পরিবর্তনে এই পাড়ায়ও কিছু লোক তাবিলের দূর-দারাজ পথ অবলম্বন করতে লাগল। তারা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এতদূর ছিটকে পড়ল যে, তারা সুবুতে মাবদার দিকে কর্ণপাত-ই করছে না! হাদিসবিদরা তাদের কঠিন সমালোচনা করেছেন, তাদেরকে সিফাত অস্বীকারকারী এবং কাফের

---

(১) এটা ইমাম মালেকের উক্তি, আততামহিদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মাআনি ওয়াল আসানিদের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

> মুশরিক সাব্যস্ত করেছেন, বরং এ কালের মূর্খরা উন্মোক্তহারে আশআরি এবং মাতুরিদিদেরকে কাফের- মুশরিক বলে থাকে। فيا للعجب، ويا لضيعة الأدب! (১)

সারকথা, এই মাসআলায় সালাফে সালেহিনের আকিদা-ই বিশুদ্ধ ও নিরাপদ। শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ হালবি রাহিমাহুল্লাহ নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে লিখেন:

> আমি আল্লাহর শোকর এবং তার অনুগ্রহে আকিদার ক্ষেত্রে সালাফে সালেহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমের আকিদায় বিশ্বাসী। আল্লাহর নামসমূহ এবং তার গুণাবলীর ব্যাপারে তাদের আকিদা-ই হচ্ছে আমার আকিদা। আল্লাহর জন্য তা-ই বিশ্বাস করি, যা তিনি নিজের জন্য প্রমাণ করেছেন এবং যা তার জন্য প্রমাণ করেছেন রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কোন ধরনের তাবিল, তাহরিফ, তাশবিহ এবং তাতিল ব্যতিরেকে।(২)

মুফতি মুহাম্মাদ শফি রাহিমাহুল্লাহ ইসতিওয়াহ শব্দের তাফসিরে বলেন: এ ব্যাপারে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন এবং বিশুদ্ধ আকিদা হচ্ছে তা-ই, যা সালাফে সালেহিন; সাহাবা, তাবেয়িন এবং পরবর্তি অধিকাংশ সুফিদের থেকে বর্ণিত। এ সব শব্দ দ্বারা আল্লাহর যা উদ্দেশ্য, তা-ই সত্য ও বিশুদ্ধ। নিজে নিজে কোন অর্থ নির্ধারণ করার চিন্তা-ভাবনা করবেন না।(৩)

---

(১) রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ, ১/৬৪৪, আলমিলাল ওয়ান নিহাল, আবুল ফাতহ মুহাম্মাদ বিন আবদুল করিম শাহরাস্তানি, মুয়াসসিসাতুল হালবি।

(২) কালিমাতুন ফি কাশফি আবাতিলা ওয়া ইফতিরাআত, পৃ. ৩৭, আবদুল ফাত্তাহ।

(৩) মাআরিফুল কুরআন, ৩/৫৭৩, নাদিয়াতুল কুরআন কুতুবখানা ঢাকা।

পরিশিষ্ট-৭

নামে যত্রতত্র উপাধিঃ আমাদের আদর্শ নয়

কারো নামের সাথে উপাধির আধিক্যতা দেওবন্দি রীতিসিদ্ধ নয়। এটা বেরলভিদের রীতি-নীতি বা মতাদর্শ। বেরলভিদের বুলেটিন, লিফলেট বা কোন পোস্টারে আপনি নজর বুলালে-ই বিষয়টি সহজে বুঝতে পারবেন। লকবের আধিক্যে নামটা পর্যন্ত তালাশ করে পাওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়! কিন্তু আজ আমরা দেওবন্দি হয়েও লকববাজিকে পছন্দ করছি! বেরলভিদের থেকেও এক কদম এগিয়ে আছি! সত্যি তা নৈরাশ্যজনক।

লবকবাজি নিষিদ্ধে কারণ হল, অহেতুক সম্মানজনক লকব থেকে-ই নানা ধরনের বিদআত এবং কুসংস্কারের উদ্ভব হয়। সাহাবা, তাবেয়িন, তাবে তাবেয়িন, আইম্মায়ে মুজতাহিদিন, মুহাদ্দিসিন এবং মুফাসসিরিন থেকে নিয়ে উলামায়ে দেওবন্দ পর্যন্ত উপাধির এই আধিক্যতা ছিল না। কারো নামের শুরুতে তিন হাত, পিছনে আরো পাঁচ হাত লম্বা লেজুড় ছিল না! সালাফে সালেহিনের সাদামাটা নাম নেয়া হত, যেমনঃ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ, মৌলভি কাসেম নানুতুভি, মাওলানা আশরাফ আলি থানভি, মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রাহিমাহুল্লাহ।

কিন্তু আফসোসের বিষয় যে, আজ আমরা বেরলভিদের পদাঙ্ক অনুসরণে নামে যত্রতত্র উপাধি লাগাচ্ছি। নিজের নামেও লাগানো পছন্দ করছি, অপরের নামেও লাগাচ্ছি! নিজের পিরের নামে লকবের তো শেষ নেই। কথায় আছে নাঃ *পির উড়তা নেহি, মুরিদ উড়াতা হে!*

আমাদের আকাবিররা এমন লকব ধারণের মেজাজকে অপছন্দ করতেন। কিন্তু আজ আমরা তাদের নামের সাথেও জুড়ে দিচ্ছি নানা উপাধি। ধরুণ মাওলানা কাসেম নানুতুভি রাহিমাহুল্লাহর কথা। তার

চালাফেরা ছিল সাদামাটা। তিনি সাধারণ পোশাক পরতে অভ্যস্ত ছিলেন। মানুষ তাকে মৌলভি বলে ডাকত। মুফতি মুহাম্মাদ শফি রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ কাসেম নানুতভি প্রত্যেক বিষয়ে অদ্বিতীয় ছিলেন। তার লিখনী এর চাক্ষুষ প্রমাণ। কিন্তু সাদাসিধার নমুনা ছিল এই যে, তার কাছে দুজোড়া কাপড় ছাড়া কিছু-ই ছিল না। মানুষ দেখে তাকে চিনতে-ই পারত না যে, তিনি মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতভি! তিনি শুধু মুসলিম নয়, বরং অমুসলিম এবং বিরোধিদের থেকেও নিজের পাণ্ডিত্যের স্বীকারপত্র নিতে সক্ষম হয়েছেন।(১)

শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ হালবি রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ

> লকব বৃদ্ধিকরণে ব্যাপকতা এবং এতে বর্ধন করাঃ সালাফের জীবনচরিতে নেই। যাদের ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যা তিনি পছন্দ করেন এবং যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট হোন, তা করার তওফিক দান করুন।(২)

---

(১) দারুল উলুম দেওবন্দ আওর উসকা মিজাজ ও মাজাক, পৃ. ১৩, মুফতি মুহাম্মাদ শফি, জাওয়াহিরুল ফিকহ ৫ম খণ্ডের সাথে মুদ্রিত, মাকাতাবায়ে সিরাতুন নবি জামে মসজিদ দেওবন্দ।

(২) আররাফউ ওয়াত তাকমিল ফিলজারহি ওয়াততাদিল, পৃ. ৩৭৪, ইত্তিহাদ বুক ডিপো দেওবন্দ।

পরিশিষ্ট-৮

শরয়ি লিবাসঃ আমরা বাড়াবাড়িতে লিপ্ত!

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু বলেনঃ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমের পোশাক সুন্নতি পোশাক হওয়ার কথা। কিন্তু কথা হল, তাদের তো নির্দিষ্ট কোন ইউনিফর্ম ছিল না। এ দিকে সমস্ত দুনিয়ার অবস্থাও এক নয়। কোথাও সীমাহীন ঠাণ্ডা আবার কোথাও অসহ্য গরম। কোথাও আবহাওয়া অনুকূলে। এমনিভাবে প্রত্যেক জাতির কালচারালও ভিন্ন ভিন্ন। এজন্য কোন নির্দিষ্ট পোশাক পুরো দুনিয়াবাসীর জন্য সুন্নাত হতে পারে না। প্রত্যেক যুগে নেককারগণের যে পোশাক হবে, তা-ই পরহেজগারি এবং সুন্নতি লিবাস হিসেবে ধর্তব্য হবে। ইউরোপ-আমেরিকার উলামা-নেককারগণ ট্রাউজার (trousers) পরিধান করে এর উপর পানজাবি পরেন। সুতরাং সেখানে তা-ই সুন্নতি ও তাকওয়ার লিবাস হিসেবে বিবেচিত হবে।

মোটকথা, প্রত্যেক এলাকায় এবং প্রত্যেক যুগের আলেমগণ এবং নেককারগণ যে পোশাক পরিধান করেন, একে-ই সুন্নত বা লিবাসুত তাকওয়া ধরা হবে। ([১])

টুপিঃ কত কলির হওয়া সুন্নাত!

টুপি গোলাকার হবে, না লম্বা হবে? কত কলির হবেঃ পাঁচ কলির না ছয় কলির? পানজাবি কলিদার হবে, না ছাড়া হবে? কয় টুকরার হবে? বর্তমানে এ নিয়ে মতভেদ করা বিলকুল অনুচিত। নিজের এলাকার উলামা-সুলাহা কোন প্রকারের টুপি-পানজাবি পরিধান করেন, তা দেখতে হবে? তারা সর্বপ্রকার পরিধান করে থাকলে, সবই পরহেজগারির পোশাক। সুন্নতি লিবাস বা পরহেজগারির নির্দিষ্ট কোন

([১]) তুহফাতুল কারি, ২/১৭৮ (কমবেশির সাথে)।

লিবাস নেই। যদিও আমাদের দেশে রয়েছে! সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমের নির্দিষ্ট কোন ইউনিফর্ম ছিল না। [১]

মুফতিয়ে আজম মুফতি মুহাম্মাদ শফি রাহিমাহুল্লাহ লিখেন: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দিষ্ট কোন লিবাস ছিল না। বরং বিভিন্ন অবস্থায়: শীত-গ্রীষ্ম, সফর-হজর এবং অন্যান্য স্বভাবগত চাহিদার কারণে বিভিন্ন প্রকার এবং বিভিন্ন রঙের পোশাক ছিল বলে বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু তার সমস্ত পোশাকে এতটুকু অভিন্ন ছিল যে, লিবাস সাদাসিধা ছিল, এতে বেশি চাকচিক্যতা ছিল না। রেশম ইত্যাদি– যা পুরুষের জন্য হারাম– ছিল না এবং এর ধরন মুসলমানদের স্বকীয়তা রক্ষা করে এমন ছিল। উল্লিখিত বস্তুগুলোর আলোকে সাধারণত লিবাসের ফিকিরে থাকা তার অভ্যাস ছিল না। সময়মত যা মিলত, উত্তম হোক বা সাধারণ হোক তা পরিধান করে নিতেন।[২]

ইবনুল কায়্যিম হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ-ই সঠিক, যা তিনি দেখিয়েছেন, বলেছেন, যার প্রতি আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন এবং যার উপর তিনি অবিচল ছিলেন: লিবাসের ক্ষেত্রে তার সুন্নত ছিল যে, যা-ই মিলত, তিনি তা-ই পরিধান করতেন।([৩])

কিন্তু আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে যে, বর্তমানে আমাদের দেশে টুপি-পানজাবি নিয়ে ঝগড়ার শেষ নেই! কোথাও নির্দিষ্ট কোন টুপি ফরজ করে দেয়া হয়েছে। আবার কোথাও অন্য টুপি। কোথাও মাদানি টুপি পরা বাধ্যতামূলক। আবার কোথাও বসুন্ধরা টুপি! মোটকথা, প্রত্যেক পিরের মুরিদদের আলাদা আলাদা সুন্নাতি টুপি রয়েছে! এমনিভাবে কোন মাদরাসায় পানজাবি ওয়াজিব করা হয়েছে,

(১) তুহফাতুল কারি, ২/১৭৮ (কমবেশির সাথে)।

(২) ইমদাদুল মুফতিন, ২/৮১০, দারুল ইশাআত করাচি (সংক্ষিপ্ত)।

(৩) জাদুল মাআদ ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদ, ১/১২৫ (লিবাস অধ্যায়)।

কোথাও আবার জুব্বা ফরজে আইন করে রাখা হয়েছে! এগুলো কী? বুঝে আসে না।

সুন্নতি লিবাস: পানজাবি না জুব্বা?

হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহু বলেন: জুব্বা হোক বা পানজাবি: নিসফে সাক তথা অর্ধগোছা পর্যন্ত হতে হবে। এটা-ই সুন্নাত। গোড়ালী পর্যন্ত জায়েজ হলেও একে সুন্নাত বলা যাবে না। গোড়ালী পর্যন্ত পরে সওয়াবের আশা রাখা মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। কারণ সুন্নাতে কমবেশি করলে সুন্নাত আর সুন্নাত থাকে না। পুরা হিন্দুস্তানের উলামায়ে কেরামগণ এই জুব্বাকে গ্রহণ করেননি। কিন্তু বাংলাদেশের কিছু উলামায়ে কেরাম একে সুন্নাত মনে করে পরিধান করে থাকেন। এটা তাদের পদস্খলন, যা আদৌ কাম্য ছিল না। গোড়ালী পর্যন্ত তো নারীর পানজাবি হয়, যাকে বোরকা বলা হয়। বোরকা পুরুষের স্বভাব-বিরুদ্ধ। এজন্য সৌদি আরবের বাদশারা নারীর পোশাক পরে কাপুরুষ হয়ে আছে। বোরকা তো নারীর পোশাক। নারী: অল্প বুদ্ধিমান। নারীর পোশাক পরলে মেয়েলীপনা আসা তো স্বাভাবিক![১]

দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া বিভাগ থেকেও বলা হয়েছে যে, টুপি এবং পোশাকে নির্দিষ্টি কোন আকৃতি প্রমাণিত নেই।([২])

সব ধরনের পোশাক বৈধ: কিছু শর্তের সাথে

যে কোন ধরনের লিবাস পরিধানে কোন বাধা না থাকলেও কিছু শর্তাবলী রয়েছে। যেমন:

১- তা নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত আবৃতকারী হতে হবে।

---

(১) সহিহ বুখারি: আবওয়াবু সিয়াবিল মুসাল্লি এ প্রদত্ত তাকরির থেকে।

(২) দেখুন: ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ ৪র্থ ভলিউম। আরো দেখুন: মুফতি দিলাওয়ার সাহেব জিদা মাজদুহুম বিরচিত ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা।

২- এমন ফাটা হবে না, যদ্দারা গভীর নজর বুলান ব্যতিরেকে সতর দেখা যায়।

৩- এমন টাইট বা সঙ্কীর্ণ হবে না, যদ্দারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণরূপে বুঝা যায়।

৪- নারীর লিবাসের সদৃশপূর্ণ হবে না। [১]

৫- কাফেরদের নির্দিষ্ট ইউনিফর্মের সদৃশপূর্ণ হবে না।

উপরিউক্ত শর্তের সাথে যে কোন ধরনের পোশাক পরা বৈধ। রাব্বা! আমাদেরকে বুঝার তওফিক দান করুন। আমিন॥

শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আলবানি (মৃত্যু: ১৪২০ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ বলেন: বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের জন্য এ কথা জরুরি নয় যে, সবাই একই পোশাক বা ইউনিফর্মে অভ্যস্ত হবেন। বরং প্রত্যেকের জন্য যা ইচ্ছা পরিধান করার স্বাধীনতা রয়েছে। কারণ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: হালাল: যা ইচ্ছা আহার কর এবং যা ইচ্ছা পরিধান কর। অপচয় এবং দাম্ভিকতার সীমা পর্যন্ত।[২]

সমাপ্ত॥

---

(১) সুনানে আবু দাউদ: ৪০৯৮।

(২) সহিহ বুখারি: কিতাবুল লিবাস।

নোট:

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

....

....

....

....

....